বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন (১৭৫৭ - ১৯৪৭ খ্রিঃ)

ইউনিট ৮

ভূমিকাঃ

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতার উপহার হিসেবে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলী খান বাংলার সিংহাসন লাভ করেছিল। তবে রাজকোষ শূন্য থাকায় প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানের জন্য মীর জাফর তাঁর ব্যক্তিগত স্বর্ণালঙ্কার, ও মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার অনুমতিও দিতে হয়েছিল তাকে। ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় সেনাবিদ্রোহ দেখা দেয়। ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা গেলেও বকেয়া বেতনের দাবিতে সংঘটিত পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়নি। মীরজাফর নবাবি পেলেও প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি তার ছিল না। ফলে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরও একটা সময় বিরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ইংরেজদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পূর্বতন বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধবোধ ও অযোগ্যতা এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে ওলন্দাজদের সঙ্গে পত্রালাপ এবং প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত অর্থ না দেয়ার অজুহাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অস্থায়ী গভর্নর ভ্যানসি ট্রাট মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলতে গেলে তখন থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু হয়। তারপর ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে বাংলার ইতিহাসে ঘটে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তার ধারাবাহিক আলোচনা রয়েছে এ ইউনিটে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহঃ

পাঠ- ১ : ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি: বক্সারের যুদ্ধ
পাঠ- ২ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভ
পাঠ- ৩ : বাংলায় দ্বৈত শাসন
পাঠ- ৪ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
পাঠ- ৫ : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ- ৬ : বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলন
পাঠ-৭ : বাংলায় সংস্কার আন্দোলন
পাঠ-৮ : সর্বভারতীয় কংগ্রেস
পাঠ ৮.৯ : বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রি.) রদ ও প্রতিক্রিয়া
পাঠ ৮.১০ : সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ
পাঠ ৮.১১ : লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬ খ্রি.)
পাঠ ৮.১২ : খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন
পাঠ ৮.১৩ : বেঙ্গল প্যাক্ট
পাঠ ৮.১৪ : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
পাঠ ৮.১৫ : ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব
পাঠ ৮.১৬ : ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও ব্রিটিশ শাসনের অবসান
পাঠ ৮.১৭ : ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ-৮.১ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমিঃ বক্সারের যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নবাব মীর কাশিম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বক্সার-যুদ্ধের পটভূমি ও কারণ সম্পর্কে জানবেন এবং
- বক্সার যুদ্ধের গুরুত্ব বা ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**মীর কাশিম, বক্সারের যুদ্ধ ও কোম্পানি শাসন**

ভূমিকাঃ পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজিত হওয়ার পর মীর জাফর নামমাত্র নবাব হতে পেয়েছিলেন। তার অল্পদিন পরে ১৭৬০ সালে ইংরেজরা মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। তিনিও কোম্পানিকে নানা সুবিধাদানের শর্ত দিয়েই ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তবে মীর কাশিম মীরজাফরের মতো অযোগ্য ও নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তার স্বাধীনচেতা স্বভাবের পাশাপাশি জনসাধারণের কল্যাণে সচেতনা ছিল উল্লেখ করার মত। এক্ষেত্রে তিনি ইংরেজদের সাথে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। তিনি আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন। প্রথমে মীরজাফরের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে নানা কারণে নবাব মীর কাশিমও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। এদিক থেকে দেখলে এই বক্সারের যুদ্ধের মধ্য দিয়েই ইংরেজ আধিপত্য উপমহাদেশে আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলার নামমাত্র টিকে থাকা স্বাধীনতা এর মধ্য দিয়েই পুরোপুরি বিনষ্ট হয়েছিল।

বক্সার যুদ্ধের পটভূমি ও কারণ

মীর কাশিম বাংলার সিংহাসনে বসেই বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে ইংরেজদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য। ইংরেজদের সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বে না জড়ালেও তাদের প্রভুর আসনে রাখতে চাওয়ার মনোবৃত্তি ছিল না তাঁর। যেভাবেই হোক ক্ষমতায় গিয়ে তিনি প্রকৃত নবাব হিসেবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা শাসন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি দেশ, জাতি এবং নিজের প্রয়োজনে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন মুলত বক্সারের যুদ্ধের নেপথ্য কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে–

১. রাজধানী স্থানান্তরঃ মীর কাশিম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক-হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। এ কাজে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে তারাই এদেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠবে। তাই তিনি রাজধানীতে ইংরেজ রেসিডেন্টের শাসনকার্যে অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ করার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রশাসনকে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এক্ষেত্রে নতুন স্থাপিত রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি এর চারপাশে নানা ধরণের পরিখা-খনন করেছিলেন। পাশাপাশি এখানে শক্তিশালী দুর্গও নির্মাণ করা হয়েছিল। তিনি ধারণা করেছিলেন ইংরেজরা পুনরায় মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাতে পারে। তাই ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি সামরু ও মার্কার নামে দু'জন ইউরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে বাংলার সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে তিনি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ হতে স্বাধীন থাকার চেষ্টা করেন। এজন্য মুঙ্গেরে তিনি কামান, বন্দুক ও গোলাবারুদ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের ইংরেজ প্রীতি ও দুর্নীতি লক্ষ্য করে তাকে পদচ্যুত করা হয়। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলে মীরকাশিমের উপর ক্ষিপ্ত হয় ইংরেজরা। এই অসন্তোষ একটা পর্যায়ে গিয়ে যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল।

২. ফরমান অবমাননাঃ মুঘল সম্রাট ফররুখ শিয়ারের কাছ থেকে ১৭১৭ সালে প্রাপ্ত একটি ফরমান বলে ইংরেজ কোম্পানি বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। দস্তক নামে পরিচিত ছাড়পত্র দ্বারা কোম্পানির মালামাল চিহ্নিত করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা এই দস্তকের অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত মালামালকেও কোম্পানির হিসেবে দেখিয়ে

শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করেছে। ফলে দেশীয় বণিকগণ ব্যবসা ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হন। অনদিকে এবং নবাব নিজেও প্রাপ্য বাণিজ্য শুল্ক হতে বঞ্চিত হতে থাকেন। যা একটা পর্যায়ে ভয়াবহ সংঘাতের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

৩. অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এমনিতেই অনেক সুবিধা ভোগ করত। তার উপর কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অবৈধ আন্ত:বাণিজ্য দেশীয় বণিকদের কোণঠাসা করে ফেলে। দস্তক নামে পরিচিত ছাড়পত্র দ্বারা কোম্পানির মালামাল চিহ্নিত করার ব্যবস্থা ছিল। এই দস্তকে সাক্ষর করতেন কোম্পানির কর্মকর্তারা। কিন্তু কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা এই দস্তকের অপব্যবহার করে নিজেদের ব্যক্তিগত মালামালকেও কোম্পানির বলে বহন করেছেন। পক্ষান্তরে ইংরেজ বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিল না তারা। মীর কাশিম এ বিষয়ে গভর্নরের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে তিনি এক পর্যায়ে ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীদের উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতে নবাবের রাজস্ব আয় কমে গেলেও দেশীয় বণিকদের সাথে বিদেশী বণিকদের অন্যায় প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ নতুন ব্যবস্থার ফলে ইংরেজদের স্বার্থে আঘাত লাগে। তারা চেষ্টা করে নবাবকে শায়েস্তা করার জন্য।

বক্সারের যুদ্ধের ঘটনাবলী

নবাব মীর কাশিমের গৃহীত নানা সিদ্ধান্ত ইংরেজদের ক্ষোভের কারণ হয়। তারা নবাবকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধের শুরুতেই কলকাতায় ইংরেজ কুঠির প্রধান এলিসের সঙ্গে নবাবের সংঘর্ষ বাধে। ইংরেজ নেতা এলিস হঠাৎ পাটনা আক্রমণ করে শহরটি দখল করে নিলে বাধ্য হয়ে নবাবকে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। মীর কাশিম পাটনা হতে এলিসকে তাড়িয়ে দিয়ে পুরো এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তারপর কোলকাতা-কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মীর কাশিম মেজর অ্যাডামসের নেতৃত্বে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। সৈন্য সংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে (১৭৬৩ খ্রি:) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন মীর কাশিম। এরপর বাধ্য হয়ে তিনি অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মীর কাশিমের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ সালে যুদ্ধ চলাকালীন ইংরেজগণ আবার মীরজাফরকে নবাব হিসেবে বাংলার সিংহাসনে বসিয়েছিল। নতুনভাবে নবাব হয়ে বিশ্বাস ঘাতক মীরজাফর মীর কাশিম কর্তৃক জারীকৃত ইংরেজ স্বার্থবিরোধী প্রত্যেকটি ঘোষণা ও বিধি প্রত্যাহার করে নেয়। বার বার পরাজিত হয়েও মীর কাশিম হাল ছাড়েননি। তিনি এরপর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাদের সহযোগিতায় গঠিত সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে ১৭৬৪ সালে মীর কাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। তবে বরাবরের মত এবারেও ভাগ্য সহায় হয়নি তার। তিনি বিহারের বক্সার নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে মেজর মনরোর সেনাদলের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। বলতে গেলে এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় স্বাধীনতা ধরে রাখার শেষ সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়। এরপর ইতিহাসের পাতায় মীর কাশিমের নাম সেভাবে পাওয়া যায়নি। অনেকের মতে তিনি আত্মগোপনে চলে গেছেন। কারও কারও বিশ্বাস নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মত তাকেও হত্যা করা হয়েছিল।

ফলাফল ও গুরুত্ব

বক্সারের যুদ্ধ বাংলার পাশাপাশি পুরো ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিয়েছিল। তাই এর ফল যুগান্তকারী এবং সুদূরপ্রসারী। অনেক দিক থেকে এ যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। নিচে এর গুরুত্বগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর হলো–

১. এ যুদ্ধে পরাজিত দিল্লির মুঘল সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করে। মূলত সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে ইংরেজদের একটা চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির বলে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে।

২. অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

৩. যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম গা ঢাকা দিয়েছিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ সালের দিকে দিল্লির কাছে তার মৃত্যু হয়। অনেকের ধারণা বাংলার এই শেষ স্বাধীনতাকামী নবাবকে হত্যা করা হয়েছিল। সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে ইংরেজদের একটি চুক্তি হয়েছিল যে চুক্তির বলে কোম্পানি বাংলা বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে।

৪. এ যুদ্ধের ফলে মীরকাশিমের ইংরেজ বিতাড়ণ ও স্বাধীনতা রক্ষার শেষ স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়। বলতে গেলে উপমহাদেশে ইংরেজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণে বেড়ে যায়।

৫. এ যুদ্ধের ফলে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বিনা বাধায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। তারা এর পর থেকেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে কুঠি নির্মাণ শুরু করে।
৬. কোম্পানির যোদ্ধারা অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল দু'টি কেড়ে নিয়েছিল।
৭. বক্সারের যুদ্ধে কেবলমাত্র মীর কাশিম পরাজিত হননি। এযুদ্ধে স্বয়ং সম্রাট শাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলাও পরাজিত হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে দিল্লি থেকে শুরু করে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের অধীনে চলে গিয়েছিল।
৮. বক্সার যুদ্ধের ফলে ক্লাইভ দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি (রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব) লাভ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মীর কাশিমের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।**

সারসংক্ষেপ:

পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বাংলার সিংহাসন লাভ করেও প্রকৃত নবাব হতে পারেননি। ১৭৬৩ সালে কলকাতা কাউন্সিল যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মীর কাশিম পরপর গিরিয়া, উদয়নালা ও কাটোয়া সেনাপতি অ্যাডামসের কাছে পরাজিত হন। পরবর্তীকালে বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রি:) পুনরায় ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরোর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বাংলার নবাবের অবশিষ্ট মর্যাদাটুকু হারিয়েছিলেন মীর কাশিম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মীর কাশিম কত সালে বাংলার সিংহাসনে বসেন?
ক) ১৭৬০ খ) ১৭৬১ গ) ১৭৬২ ঘ) ১৭৬৩

২। কত সালে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক) ১৭৬২ খ) ১৭৬৩ গ) ১৭৬৪ ঘ) ১৭৬৫

৩। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের সেনাপতি ছিলেন–
ক) এলিস খ) মনরো গ) এডামস ঘ) হলওয়েল

৪। মীর কাশিম রাজধানী স্থানান্তর করেন কোথায়?
ক) মুঙ্গেরে খ) পাটনায় গ) কলকাতায় ঘ) উদয়নালায়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে মীর জাফরকে সিংহাসনে বসায়। তারপর মীর জাফরের স্থলে যিনি আসেন তিনি বিশ্বাসঘাতক নন। তিনি ইংরেজদের প্রভু মানতেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে ইংরেজ ও এ দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীর উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর থেকে পরিস্থিতি বদলে যায়। নতুন এক নেতার আবির্ভাব ঘটে। তিনি চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজদের আধিপত্য থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে। উদ্দীপকটি পড়ে উত্তর দিন–

ক) মীর কাশিম কে ছিলেন? ১
খ) বক্সারের যুদ্ধের মূল কারণ কি? ২
গ) উদ্দীপকে আলোচিত যুদ্ধের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধের কি কি মিল রয়েছে? ৩
ঘ) বক্সারের যুদ্ধের সুদূর প্রসারী প্রভাব কি আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.২ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দিউয়ানি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- রবার্ট ক্লাইভ কিভাবে কোম্পানির পক্ষে দিউয়ানি লাভ করে তা জানতে পারবেন এবং
- ক্লাইভের দিউয়ানি লাভের ফলাফল কি ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**দিউয়ানি, রবার্ট ক্লাইভ ও কোর্ট অব ডিরেক্টর্স**

ভূমিকা: পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় বাংলায় এক অর্থে নবাবি শাসনের পতন ঘটিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ইংরেজদের আজ্ঞাবহ হয়েই শাসনকাজ চালাতে শুরু করেন। তখন ইংরেজদের গতিরোধ করার মতো শক্তি ও সাহস এদেশে আর কারো ছিল না। তখন থেকেই বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজরা সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে। তারা রাজনৈতিক প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিজের মত করে নিতে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে মুঘল শাসনতন্ত্রে প্রদেশ শাসনের জন্য দু'টি সমপর্যায়ের পদ ছিল। এর একটি পদ ছিল সুবাদারি অন্যটি ছিল দিউয়ানি। সুবাদার ও দিউয়ান উভয় ব্যক্তিই সরাসরি দিল্লির সম্রাটের কাছে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। তাঁরা একে অপরকে প্রশাসনিক সহযোগিতা করতেন। তবে তারা কেউ একে অন্যের অধীনও ছিলেন না। তখনকার দিকে সুবাদারের দায়িত্ব ছিল বিচার, প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা। পাশাপাশি দিউয়ানের দায়িত্ব বর্তায় রাজস্ব তথা খাজনা আদায়ের। কোনওভাবে বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠতে পারেন। এই ভেবেই ক্ষমতা বিভাজনের এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনও ছিল এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৭১৭ সালে সুবেদারের দায়িত্ব প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত মুর্শিদ কুলি খান বাংলার দিউয়ান ছিলেন। তবে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসনকারী এই নবাব এবং তাঁর উত্তরসূরীরা একইসঙ্গে সুবাদার ও দিউয়ানের দায়িত্ব পালন করতেন। শুধু তাই নয়, মারাঠা উৎপাতের কারণে আলীবর্দী খান কেন্দ্রকে রাজস্ব পাঠানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের আমলে কেন্দ্রকে রাজস্ব দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানি হয়ে ওঠে পুরো দেশের হর্তাকর্তা। তারপর কেন্দ্রিয় রাজনীতি তথা সমগ্র উপমহাদেশের রাজনীতি বদলে যায়। তখন সবকিছু এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যা থেকে উত্তোরণের পথ ছিল না। ফলে সুবে বাংলা আবার আগের মতো দিল্লিতে রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করে দেয়। বলতে গেলে সম্রাট শাহ আলম বাংলা থেকে রাজস্ব প্রাপ্তির আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। এমনি পরিস্থিতিতে সম্রাট কয়েকবার কোম্পানিকে বাৎসরিক কিছু উপঢৌকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তখন তার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিল কোম্পানি। পরে বক্সার যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে। তাদের হঠকারিতায় বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ খারাপ হয়। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানির দুর্নীতি দমন ও স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য ক্লাইভকে লর্ড উপাধি দিয়ে দ্বিতীয় বারের মত বাংলায় প্রেরণ করে (১৭৬৫-১৭৬৭ খ্রি:)। বাংলায় এসে ক্লাইভ মীর কাশিমের মিত্রশক্তি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের প্রতি নজর দেন। বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের নিকট থেকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টির দখল নেয়া হয়। এরপর তিনি অযোধ্যার নবাবের সাথে মিত্রতা স্থাপনের পাশাপাশি দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথেও সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। বছরে ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাটের কাছ থেকে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানির দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর ১৭৬৫ সালে ১২ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানির সনদ অর্জন করেছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভের ফলাফল ও গুরুত্ব

বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর ফলে নতুন গতিপথ লাভ করে বাংলার ইতিহাস। এক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো দৃশ্যমান হয়েছিল তা হচ্ছে–

রাজনৈতিক বিজয়: বাংলায় কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ছিল কোম্পানির জন্য একটি বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। এর ফলে সম্রাট ও নবাব একেবারে ক্ষমতাহীন হয়ে ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। রাজস্ব আদায়ের অধিকার এবং সেনাদল রাখার মতো অর্থবল ছিল না নবাবের। নবাবকে নামমাত্র সিংহাসনে বসিয়ে রেখে কোম্পানিই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বাংলায় কার্যত: ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে।

অর্থনৈতিক সুবিধা: বাংলায় দিউয়ানি লাভ ছিল কোম্পানির জন্য একটি বিরাট অর্থনৈতিক বিজয়। এর ফলে কোম্পানি নিজের দেউলিয়া অবস্থা হতে রক্ষা পায়। দিউয়ানি লাভের সুযোগ সুবিধা কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে জানতে গিয়ে লর্ড ক্লাইভ উল্লেখ করেন যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাবে তা দিয়ে, সম্রাট ও নবাবের নির্ধারিত ভাতা ও অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক ব্যয় বাদ দিলেও কোম্পানির হাতে প্রকৃত আয় থাকবে ১২ কোটি টাকারও অধিক।

কোম্পানির পুঁজি বৃদ্ধি: লর্ড ক্লাইভ এক পত্রে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে জানিয়েছিলেন যে, ঐ উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানির গোটা বাণিজ্য বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট। ফলে দিউয়ানি লাভের আগে এ দেশে বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপ হতে কোম্পানি যে বিপুল পুঁজি নিয়ে আসতো দিউয়ানি লাভের পর তার আর প্রয়োজন থাকে না এবং ব্যবসার সমস্ত পুঁজি প্রদেশের রাজস্ব হতেই সংগ্রহ করা হয়।

অবাধ বাণিজ্য: বাংলায় দিউয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পায়। এতে কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থের লোভ দিন দিন বাড়তে থাকে। অসদুপায়ে রাজস্ব আদায় করলেও কোম্পানির কর্তারা কোন পদক্ষেপ নিতেন না। এভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে এদেশের মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

সম্পদ পাচার (Drain of Wealth): কোম্পানির দিউয়ানি লাভের পর বাংলা থেকে ব্যাপকভাবে অর্থ ও সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। তাই ১৭৬৫ সালে বাংলার দিউয়ানি লাভ প্রকৃত অর্থে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর ফলে বাংলা ধীরে ধীরে অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। একটা পর্যায়ে এসে এদেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলায় কোম্পানির দিউয়ানি লাভের উপর একটি নিবন্ধ রচনা করবেন।**

সারসংক্ষেপ :

বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয়ের পর বাংলা তথা উপমহাদেশে ইংরেজদের দিউয়ানি লাভ ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনের ইতিহাসে একটি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মীরকাশিমের নবাবি লাভের আগেই ক্লাইভ ইংলন্ডে ফিরে যান। কিন্তু ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এদেশে কোম্পানির দুর্নীতি দমনের ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আবার তাঁকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করে দ্বিতীয় বার এদেশে প্রেরণ করে। তিনি মুঘল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করেন। এর বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কত সালে কোম্পানি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে?
ক) ১৭৬৪ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৬ ঘ) ১৭৬৭

২। প্রতি বছর কত টাকার বিনিময়ে কোম্পানি দিউয়ানি লাভ করে?
ক) ২৪ লক্ষ খ) ২৫ লক্ষ গ) ২৬ লক্ষ ঘ) ২৭ লক্ষ

৩। কোন নবাবের সময় থেকে দিল্লিতে রাজস্ব পাঠানো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়?
ক) আলীবর্দি খান খ) সিরাজদ্দৌলা গ) মীর জাফর ঘ) মীর কাশিম

৪। মুঘল শাসনতান্ত্রিক প্রথা ভঙ্গ করে কে প্রথম সুবাদারির পদটিও নিজে দখল করেন?
ক) আলীবর্দি খান খ) সিরাজউদ্দৌলা গ) মীর জাফর ঘ) মুর্শিদকুলী খাঁন

৫। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভের ফলে–
i. বাংলায় আইনত: ও কার্যত: ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়
ii. ব্যবসার সমস্ত পুঁজি প্রদেশের রাজস্ব থেকেই সংগ্রহ করা হয়
iii. ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

মামুন একজন প্রাদেশিক সুবাদার। মুঘল শাসনতন্ত্রে প্রদেশ প্রশাসনে দুটি সমপর্যায়ের পদ ছিল। একটি সুবাদার অন্যটি দিউয়ান। সুবাদার ও দিউয়ান উভয়ই সরাসরি সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতেন। তারা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারতেন; কিন্তু একে অন্যের অধীনও ছিলেন না। সুবাদারের দায়িত্ব ছিল বিচার প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা, অন্যদিকে দিউয়ানের দায়িত্ব ছিল রাজস্ব প্রশাসন। দিউয়ানের অর্থই হলো– রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করা। কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যেন সেচ্ছাচারী ও স্বাধীন হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই ক্ষমতা বিভাজনের এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মামুন মুঘল শাসনতান্ত্রিক এই প্রথা ভঙ্গ করে দিউয়ানের পদটিও নিজে দখল করেন।

ক. ক্লাইভকে কখন লর্ড উপাধী প্রদান করা হয়? ১
খ. "হয় খ্রিস্টাধর্ম গ্রহণ কর অথবা মৃত্যুবরণ কর"– ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের মামুনের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে সুবাদারের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তার শাসন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. ইংরেজদের দিউয়ানি লাভের ফলাফল বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৮.৩ বাংলায় দ্বৈতশাসন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বৈত শাসন বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলায় দ্বৈত শাসনের ফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ও
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কি তা জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**দ্বৈত শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ডালহৌসি, এলাহাবাদ ও আমিলদারী**

ভূমিকা: ১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তি বলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করেছিল ইংরেজরা। তখন দ্বিতীয় বারের মত বাংলার গভর্নর হয়ে এসে এদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এক নতুন দ্বৈত শাসন নীতি প্রর্বতনের চেষ্টা করেন। দিউয়ানি এবং নিয়ামত-এই দুটি শাসন কাজের ভাগাভাগিকে এক অর্থে দ্বৈত শাসন বলা যায়। রাজস্ব আদায় ও দেশ রক্ষার ভার ছিল কোম্পানির উপর। অন্যদিকে নিজামত তথা বিচার ও প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব বর্তায় নবাবের উপর। কোম্পানির সরাসরি দিউয়ানির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যে অর্থ ও লোকবল প্রয়োজন তা যেমন ছিলনা, তেমনি এদেশীয় ভাষা ও আইন কানুন সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের জ্ঞানও ছিল না। তাই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ তাদের জন্য সম্ভব ছিল না। এ সকল দিক চিন্তা করেই তারা দ্বৈত শাসন নীতি প্রবর্তন করা হয়েছিল।

বাংলায় দ্বৈতশাসন

সরাসরি রাজস্ব আদায় করা কোম্পানির জন্য বিপদজনক হয়ে দেখা দেয়। কেননা সরাসরি কোম্পানি রাজস্ব গ্রহণ করলে বাংলায় বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সাথে তাদের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। বিশেষ করে, বাণিজ্যিক শুল্ক আদায় ছিল দিউয়ানির কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। অন্য সব ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো এদেশীয় সরকারকে শুল্ক দিতে রাজী থাকলেও ইংরেজদের শুল্ক দেয়ার কথা নয়। ফলে লর্ড ক্লাইভ কৌশলে দিউয়ানির সমস্ত শাসনভার নামমাত্র দিয়েছিলেন নবাবের উপর। আর কোম্পানির কাছে রাখা হয় কেন্দ্রিয়ভাবে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা। নবাবের ভাতা এবং শাসনকাজের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকড়ি বরাদ্দ রেখেছিল। উদ্বৃত্ত প্রায় সব অর্থ কোম্পানি গ্রহণ করতো। তাদের গৃহীত এ ব্যবস্থার ফলে দায়দায়িত্ব কাগজে কলমে না নিয়েও প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় কোম্পানির হাতে। এক্ষেত্রে নবাব প্রায় ক্ষমতাহীন থেকেও প্রায় সব দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাকে। আর কোম্পানি কাগজে কলমে কোনো ক্ষমতা না রেখেও পুরো শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে যায় এই দ্বৈতশাসন নীতির মধ্য দিয়ে।

দীর্ঘদিনের শাসনে বাংলার নবাবগণ ছিলেন একাধারে নাজিম ও দিউয়ান। নাজিম হিসেবে তাঁরা শাসন, বিচার ও প্রতিরক্ষার কাজ চালাতেন। আর দিউয়ান হিসেবে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বটাও ছিল তাদের। তবে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাবের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয়। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব বেড়ে যায় অনেকাংশে। অর্থ ও ক্ষমতা ছাড়া দায়িত্ব অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে তাদের রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে ফৌজদারী ও দিউয়ানি বিচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রকৃত কর্তৃত্ব কোম্পানির হাতেই থেকে যায়। নবাব অনেক দায়িত্ব বহন করে শুধুমাত্র বৃত্তিভোগী হিসেবে নানা দুর্ভোগের শিকার হন। প্রথমত, নবাব নাবালক হওয়ার অজুহাতে ক্লাইভ তাঁর অভিভাবক হিসেবে রাজস্ব বিশারদ সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাকে নায়েব নাজিম উপাধি দান করা হয়। বাস্তবে তার উপরেই বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিতে দেখা যায়। পাশাপাশি বিহারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয় রাজা সেতাব রায়কে। এরা কোম্পানির প্রতিনিধি বিশেষ দিউয়ান। তাদের উপাধি দেয়া হয় নায়েব দিউয়ান। কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থে এরা রাজস্ব আদায় করত। পাশাপাশি কোম্পানির প্রায় সব আদেশ মেনে চলতে দেখা যায় এদের। পক্ষান্তরে কোম্পানির পক্ষ থেকে তাদের উপর নজর রাখা হয়। এজন্য মুর্শিদাবাদ দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধিও অবস্থান করত

তখন। ফলে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নানামুখী জটিলতার সৃষ্টি হয়। আদায়কৃত রাজস্ব থেকে শাসন কার্যের সকল ব্যায় মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অর্থ রেজা খানকে কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হতো। রাজস্ব সংগ্রহের হার বাড়ানো বা কমানোর ক্ষমতা ছিল কোম্পানির হাতে। এক পর্যায়ে রেজা খান ভয়াবহ এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তখন তার প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষ নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রি:) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিতি পেয়েছে।

ফলাফল

লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে বাংলার সমৃদ্ধির দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে কুফল ছিল বস্তুত অস্বাভাবিক রকম বেশি। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এক অর্থে বাংলার মানুষের শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করেছিল। বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে এর ফলাফল বর্ণনা করা হলো–

ক্ষমতাহীন নবাব: দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় নবাবের দেশ শাসনের দায়িত্ব ছিল নামমাত্র। বাস্তবে নবাবের কোন ক্ষমতাই ছিল না। অন্যদিকে, কোম্পানির হাতে সব ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হলেও তাদের কোনও দায়িত্ব ছিল না। কর্তৃত্বের এরূপ বিভাগ বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে না। ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলায় অবহেলার দরুন ডাকাতরা গ্রাম-বাংলায় লুঠতরাজ চালাতে থাকে। নবাব ও কোম্পানি কোন পক্ষই এদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেননি। ফলে অভাব অনটন আর নিরাপত্তাহীনতায় গ্রাম-বাংলা জনশূন্য হতে থাকে।

কৃষি ও শিল্পের অবনতি: অনৈতিক দ্বৈত-শাসনের ফলে বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলে বহু বিদেশি ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি এদেশের পণ্য কিনে নিয়ে যেত। কিন্তু কোম্পানির নতুন বাণিজ্য নীতির ফলে এদেশের ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরেজদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায়। ফলে দেশী ও অন্যান্য বিদেশী ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের রপ্তানি আয় তলানিতে নেমে যায়। তখন ব্রিটিশ সরকার ইংলন্ডে কমদামী মুর্শিদাবাদী রেশম আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিল। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের বেশি দামী রেশম শিল্পকে বাঁচাতে তারা আরও অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিল। এর মাধ্যমে এদেশীয় কারিগররা বিলুপ্তির মুখে পড়ে।

'আমিলদারী'-প্রথা: দ্বৈত শাসন-প্রবর্তনের ফলে, বাংলায় 'আমিলদারী'-প্রথার উদ্ভব হয়। রেজা খান বিভিন্ন জেলার আমিলদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতেন। যেহেতু আমিলদের দায়িত্বের মেয়াদ ছিল স্বল্পদিন, তাই তারা যেভাবেই রাজস্ব বেশি করে আদায় করতো। কারণ জেলার যে জমিদার যত বেশি রাজস্ব দিতে পারতো আমিলরা তাঁদেরকেই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিত। এতে করে জমিদাররা ইজারাদারে পরিণত হয়। ফলে বাংলার জনজীবন আমিলদারী ব্যবস্থায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কৃষক নিপীড়ন: কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফলে দেশের সম্পদ কমে যায়। সম্পদ পর্যায়ক্রমে ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকায় রাজস্বের হার প্রতিবছর বাড়তে দেখা যায়। এক পূর্ণিয়া জেলার বাৎসরিক রাজস্ব মাত্র চার লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে পঁচিশ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এমনিভাবে দিনাজপুর জেলার রাজস্ব বার লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে সত্তর লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। অতিরিক্ত এই রাজস্ব সংগ্রহ করতে রেজা খানের উপর চাপ আসে। রাজস্ব সংগ্রহ করতে রেজা খানকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ফলে অনেক পরগনা হতে রায়তরা আমিলদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অন্য জায়গায় পালিয়ে যায় বা পেশা পরিবর্তন করে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর: দিউয়ানি ও দ্বৈত শাসনের চূড়ান্ত পরিণাম ছিল বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। দ্বৈত শাসনের দায়িত্বহীনতার ফলে বাংলার জনজীবনে অরাজকতা নেমেছিল যেমন একদিকে, অন্যদিকে অবাধ লুণ্ঠন ও যথেচ্ছভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে গ্রাম্যজীবন ধ্বংস হয়ে যায়। একই সঙ্গে পরপর দু'বছর অনাবৃষ্টি ও খরা দেখা দেয়। ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। এটাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এসময় টাকায় একমণ হতে চালের মূল্য বেড়ে গিয়ে টাকায় তিন সেরে এসে দাঁড়ায়। খোলাবাজারের খাদ্যশস্য বেশি লাভের আশায় কোম্পানির কর্মচারীরা মজুদ শুরু করে। ফলে খাদ্যের অভাবে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মারা যায়। দলে দলে সাধারণ মানুষ শুধু খাবারের আশায় কলকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের দিকে ছুটতে থাকে। তবে কোম্পানির পাশবিক নীতির মুখে এ সময়েও খাজনা মওকুফ করা হয়নি। ইংল্যান্ডের ভয়াবহ ব্ল্যাক ডেথের মত এই দুর্ভিক্ষের মৃত্যুথাবা ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছিল একঅর্থে ভয়ঙ্কর এবং সর্বনাশা। এর ফলে গ্রাম-বাংলা প্রায় জনশূন্য হয়।

এই দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ জেলাগুলো ছিল নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম, বর্ধমান, যশোহর, মালদহ, পূর্ণিয়া ও চব্বিশ পরগণা। অন্যদিকে বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে বিশেষ ফসলহানি হয়নি। ফলে এখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তেমন একটা ছিল না। তাছাড়া 'নাজাই' প্রথার প্রকোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কৃষকেরা ভিটে মাটি ছেড়ে পালায়। 'নাজাই' প্রথার অর্থ ছিল, কোন একজন রাজস্ব বাকী ফেললে সেই গ্রামের অন্য কৃষকদের সেই রাজস্ব দিতে হতো। এই বিশেষ কারণে মন্বন্তরের ফলে বহু কৃষক মারা যাওয়ায় তাদের বকেয়া রাজস্বের দায়িত্ব জীবিত কৃষকদের উপর বর্তায়। এই চাপ বহন করতে না পেরে বহু কৃষক জমির স্বত্ব ছেড়ে সরাসরি পাইকে পরিণত হয়। সামগ্রিকভাবে কৃষির অবনতি ও অনাবৃষ্টির ফলে এই ভয়াবহ দুর্যোগ বাংলার জনজীবনকে গ্রাস করেছিল। এ সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের চিহ্ন বাংলায় প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষের প্রাণহানির পর শেষ পর্যন্ত দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে। কোম্পানির রাজস্ব আহরণ থেকে আয়-কমে যায়। তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যেও মন্দা দেখা দেয়। তাই কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি বাংলার কৃষি ও শিল্পকে বাঁচাতে নানা উদ্যোগ নিতে দেখা যায় ইংল্যান্ডের কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষ থেকে। এজন্য ইংল্যান্ড থেকে দ্বৈত শাসন লোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। যার অংশ হিসেবে কোম্পানির রাজস্ব আহরণ ও শাসনের দায়িত্ব প্রত্যাহার করে নিতে ওয়ারেন হেস্টিংসকে নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশেষে নানা কুফল যাচাই করে ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কিত চিত্রকর্মগুলো দেখবেন।**

সারসংক্ষেপ :

পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের পর বাংলার দিউয়ানি ও দ্বৈত-শাসন লাভের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায় কোম্পানির শাসন। রবার্ট ক্লাইভ এদেশে যে শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সম্রাট ও নবাবকে ক্ষমতাহীন করে তোলা। দিউয়ানি ও দেশরক্ষার দায়িত্ব কোম্পানির হাতে থাকায় নামমাত্র বিচার ও শাসনভার নিয়ে অনেকটাই নখদন্তহীন হয়ে পড়েছিলেন নবাব। সাধারণ মানুষের জন্য দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে এনেছে বেশি। কৃষির অবনতি, কৃষক শোষন ও অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ সালে দেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার পেছনে দায়ী এই দ্বৈত শাসনই। ইতিহাসে এ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। অবশেষে ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কত সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা শুরু হয়?
ক) ১৭৫৭ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৭ ঘ) ১৭৭০

২। বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে?
ক) রেজা খান খ) সেতাব রায় গ) নজমুদ্দৌলা ঘ) রামনারায়ন

৩। কত সালে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়?
ক) ১৭৭০ খ) ১৭৭১ গ) ১৭৭২ ঘ) ১৭৭৩

৪। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলায় কত লোক মারা যায়?
ক) এক ষষ্ঠাংশ খ) এক পঞ্চমাংশ গ) এক চতুর্থাংশ ঘ) এক তৃতীয়াংশ

৫। কত সালে রবার্ট ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যান।
ক) ১৭৭৫ খ) ১৭৭৬ গ) ১৭৭৭ ঘ) ১৭৭৮

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জুলির নানা ব্রিটিশদের রাজকর্মচারী ছিলেন। মায়ের কাছে জুলি ব্রিটিশ শাসনের গল্প শুনছিল। মা বললেন– তখন বাংলা ১১৭৬ সাল। লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসনে মানুষ জর্জরিত। কোম্পানির হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেয়া হলো। উপরোক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরপর দুই বছর মাঠে কোন ফসল ফলেনি। না খেয়ে মারা যায় বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ। যারা বেঁচে ছিলেন তাদেরকে পরিশোধ করতে হলো মৃত্যু মানুষের খাজনা। ফলে উজাড় হয়ে যায় গ্রাম-বাংলার জনপদ। মায়ের চোখ-ঝাপসা হয়ে আসে। জুলি মাকে থামিয়ে দেয়।

ক. কত সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়? ১

খ. নাজাই কর কী? ২

গ. উদ্দীপকের জুলির মায়ের গল্পের সাথে পাঠ্য পুস্তকের সে দুর্ভিক্ষের সাদৃশ্য আছে তা বর্ণনা করুন। ৩

ঘ. "দ্বৈত শাসন বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল"– বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৮.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ পদ্ধতিটির সুফল ও কুফল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস ও উপ-স্বত্বভোগী**

ভূমিকা: ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় কোম্পানির শাসন। ওয়ারেন হেস্টিংসের পর ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন। তার শাসনকাল নানাবিধ সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এর মধ্যে বেশী উল্লেখযোগ্য। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা নিশ্চিত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। এজন্য লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত এক নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব কোম্পানির কাছে উপস্থাপন করেন, যা ১৭৯৩ সালে অনুমোদন পায়। বাংলার ইতিহাসে এই ব্যবস্থা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সবমিলিয়ে এর প্রভাব ছিল বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য

১৭৭২ সালের পর থেকেই ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর পক্ষে কর্নওয়ালিস নানাবিধ যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি মনে করতেন ভূমি ব্যবস্থায় স্থায়ীত্ব এলে স্বাভাবিকভাবেই জমিদারগণ ভূমিতে পুঁজিবিনিয়োগ করবেন। পরে তারা নিজ স্বার্থে উদ্ধৃত্ত অর্থ জমির উন্নয়নে ব্যবহার করবেন। এটা করা সম্ভব হলে জমি উন্নত হবে। উন্নত জমিতে চাষ করলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে। আর কৃষি উন্নয়ন বাড়লে চাঙ্গা হবে দেশের অর্থনীতি। কর্নওয়ালিস তার ব্যক্তি জীবনে একজন জমিদারের ছেলে ছিলেন। ফলে সহজেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইংল্যান্ডে যেমন ভূম্যধিকারী সমাজ কৃষিতে বিপ্লব সাধন করেছিল, তেমনি উপমহাদেশেও অনুগত জমিদার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব সম্ভব হবে। তাই তিনি প্রজার দিকে তেমন নজর দিতে চেষ্টা করেননি। উল্টো তিনি এমন এক অভিজ্ঞ জমিদার শ্রেণি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন যারা শত বাধার মধ্যেও ইংরেজদের অনুগত থাকবে। আর এমনিভাবেই এ শ্রেণী হবে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন টিকিয়ে রাখার অন্যতম রাজনৈতিক ভিত্তি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি

কর্নওয়ালিস যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার অন্ত ছিল না। এর আগের গভর্নর হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসনা বন্দোবস্ত (১৭৭২ খ্রি:) চালু করেছিলেন। এতে ভূমি রাজস্ব নিলাম করা হতো। শেষ পর্যন্ত যিনি সর্বোচ্চ দরদাতা হতেন তিনিই জমির মালিক হতেন। এ ব্যবস্থায় উচ্চহারে নিলাম ডাক নিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিলেও সে অনুপাতে রাজস্ব আদায় না হওয়ার পাশাপাশি সময়সীমা থাকায় জমিদারগণ প্রজাপীড়ন করলেও ভূমির উন্নয়ন করেনি। ফলে বছরের পর বছর কৃষকগণ জমি চাষ থেকে বিরত থাকে। এই সব জমি বছর ধরে অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে। সময়ের আবর্তে এসব জমির দাম কমে যেত। এই কুফল দূর করতে হেস্টিংস জমিদারগণের সাথে 'একসনা' ব্যবস্থা চালু করেন, কিন্তু তাতেও বিশেষ সুফল হয়নি। এখানেও সরকার, জমিদার ও প্রজাদের অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে কর্নওয়ালিস দশসনা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন (১৭৮৯ খ্রি.)। সাথে সাথে কর্নওয়ালিস এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে স্যার জন শোরের সাথে কর্নওয়ালিসের নানা তর্ক বির্তক হয়েছিল।

অবশেষে কোম্পানি বোর্ড অব ডিরেক্টর্স এর অনুমোদন লাভের পর কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে জমির উপর জমিদারদের মালিকানা, ক্ষমতা এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জমি হস্তান্তর বা দান

করার ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন তারা। অন্যদিকে জমিদারগণ নিজ খুশী মত শর্ত সাপেক্ষে জমি পত্তন বা ইজারা দেয়ার ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা, বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা বাদে প্রায় সব ক্ষমতাই চলে যায় জমিদারদের হাতে। নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলেও এই ব্যবস্থায় জমির রাজস্ব কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দিতে সক্ষম না হলে জমি নিলামে বিক্রি করার বিধান ছিল। ইতিহাসে এ অনৈতিক নিয়ম 'সূর্যাস্ত আইন' নামে পরিচিতি পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে সুফলের পাশাপাশি কুফলও ছিল চোখে পড়ার মত। বলতে গেলে এর নামমাত্র সুফলগুলো কুফলের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

সুফল

পজমিদারগণ জমির স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। তারা ক্ষেত্রবিশেষে জমির উন্নতি বিধানের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। এর ফলে জমির উৎপাদন শক্তি ও মূল্য বেড়ে যায়। সরকার প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছিল। ফলে নতুন জমিদারশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ সৃষ্টি হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট নতুন প্রভাবশালী জমিদারগণ ইংরেজ সরকারের নানা কাজে সহায়তা করে। পাশাপাশি তাদের প্রভাবে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা ক্ষেত্রবিশেষে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এর পর থেকে অনেকটা লোক দেখানো হলেও বাংলার সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনেও বিশেষভাবে মনোযোগ দেয় তারা। বিত্তবান জমিদারগণ নিজের সুনাম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে। পাশাপাশি তারা অনেক জলাশয় ও দীঘি খনন করে। বেশকিছু রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং পালা পার্বন ও সামাজিক উৎসবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে দেখা যায় জমিদারদের। অন্যদিকে বাংলার গ্রামীন জীবন সচল হয়ে উঠতে দেখা যায় নানা আয়োজনে। এ সময়েই জমিদার শ্রেণি ও কৃষক শ্রেণির মধ্যে সংযোগের মাধ্যমরূপে কৃষিজমির উপ-স্বত্বভোগী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণি ব্রিটিশদের রাজ্য শাসনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। আয় সুনিশ্চিত হওয়াতে কোম্পানির বার্ষিক বাজেট প্রণয়ণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুবিধা হয়। অস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত কুফলগুলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা দূর করা সম্ভব হয়েছিল।

কুফল

প্রথমত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সঠিক জরিপের মাধ্যমে জমি ভাগ করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে নিষ্কর জমির উপর বেশি পরিমাণ রাজস্ব নির্ধারিত হয়। পাশাপাশি জমির সীমানা নির্ধারিত ছিল না। ফলে পরবর্তীকালে মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হতে থাকে যা পুরো ব্যবস্থার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়। এই ব্যবস্থার ফলে পরবর্তীকালে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে তার ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হয়নি। বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হলেও সরকার বর্ধিতাংশ থেকে বঞ্চিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ প্রজা ও কৃষকদের কোন উন্নতি হয়নি। জমিতে প্রজাদের পুরাতন স্বত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়। এতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে তারা জমিদারদের করুণার উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। জমিদার ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তাকে উচ্ছেদ করতে পারতেন। পরিশ্রম করেও কৃষকগণ যথাযথ পারিশ্রমিক না পাওয়ায় চরম দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়। সূর্যাস্ত আইনের কঠোরতার জন্য অনেক বড় বড় জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে বর্ধমানের, নাটোরের, দিনাজপুরের, নদীয়ার, বীরভূমের ও বিষ্ণুপুরের জমিদারী ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের জমিদারী ছাড়া আর অন্য সব জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম সাত বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের স্থলে ফড়িয়ারা জমিদার হয়ে এসে রায়তদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। জমিদারীর স্বত্ব ও আয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নায়েব গোমস্তাদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে জমিদারগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস শুরু করে। শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বটে গ্রাস ধারণ করে বিবর্ণরূপ। ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে। জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করে অনায়াসে সম্পদ ও মর্যাদা লাভের আশায় শিল্প-বাণিজ্য পরিত্যক্ত হতে থাকে। ফলে গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প ও শ্রম শিল্প ক্রমশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বেশিরভাগ মানুষ তখন জমিদারির দিকে ঝুঁকে পড়ায় শেষ পর্যন্ত কৃষি এবং শিল্প প্রায় বিপন্নের দিকে মোড় নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়। উইলিয়াম হান্টারের মতে, "গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমান পরিবারগুলোর অস্তিত্ব হয় পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে, না হয় ইংরেজদের সৃষ্ট নতুন ধনী সমাজের নীচে এ সময় ঢাকা পড়েছে।" এর মাধ্যমে একটি বিশেষ শ্রেণি তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। বন্দোবস্তের পর বিভিন্ন জমিদারের নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ সালে রাজস্ব আইন দ্বারা

খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করেন। ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন দ্বারা জমি থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ভারত-পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়ে দিয়ে প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি জমির বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল নিয়ে একটি নিবদ্ধ লিখবেন।**

সারসংক্ষেপ :

১৭৮৬ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের পরে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি হেস্টিংস কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনার অসুবিধাগুলো লক্ষ করেন। পরে অন্য অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তার জন্য এক নতুন প্রথার প্রবর্তন করেন যা ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ছিল ইংরেজদের একটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা যার সুফলের চেয়ে কুফলই ছিল বেশি। তবে এর মধ্য দিয়ে এদেশের সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন কে?
ক) কর্নওয়ালিস খ) ওয়েলেসলি গ) বেন্টিংস ঘ) ডালহৌসি

২। কত সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদিত হয়?
ক) ১৭৯২ খ) ১৭৯৩ গ) ১৭৯৪ ঘ) ১৭৯৫

৩। কর্নওয়ালিসের বাবা ছিলেন–
ক) রাজা খ) লর্ড গ) জমিদার ঘ) সাধারণ প্রজা

৪। প্রজাস্বত্ব আইন করা হয় কত সালে?
ক) ১৮৮২ খ) ১৮৮৩ গ) ১৮৮৪ ঘ) ১৮৮৫

৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কত সালে উঠিয়ে দেয়া হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫০ গ) ১৯৫২ ঘ) ১৯৫৪

৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে–
i. রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়
ii. জমির উপর জমিদারদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়
iii. জমিদাররা জমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জনৈক ব্যক্তি একটি গার্মেন্টস তার পূর্বের মালিকের কাছ থেকে প্রচুর অর্থমূলে কিনে নিয়েছেন। তিনি অতিরিক্ত মুনাফার আশায় কর্মচারীদের রাত দিন শ্রম দিতে বাধ্য করেন। তাদের বেতন আগের তুলনায় কমে গেছে। তাদের অনেকে অতিরিক্ত শ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ পালিয়ে যেতে থাকে গার্মেন্টস ছেড়ে। একটা সময় ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্দীপকটি পড়ে উত্তর দিন–

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি ১
খ. চিরস্থাযী বন্দোবস্ত কোনো করা হয়েছিল? ২
গ. এ বন্দোবস্তের ফলে লাভবান হয় কারা উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করুন। ৩
ঘ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব কি ছিল– ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৮.৫ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণগুলো জানতে পারবেন;
- প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম কেনো ব্যর্থ হয়েছিল তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও এর প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**স্বত্ববিলোপনীতি, লাখেরাজ সম্পত্তি, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ধর্মীয় স্বাধীনতা**

ভূমিকা

পলাশী যুদ্ধের প্রায় এক শতক পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহীদের অংশগ্রহণে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করা হয়। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরম শোষণের পাশাপাশি সামাজিকভাবে হেয় করার চেষ্টা করে এদেশীয় মানুষকে। পাশাপাশি তারা যখন ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাতের চেষ্টা করে তখন বিক্ষেভে ফেটে পড়েছিল বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার ভারতীয় সেনারা। অনেকগুলো কারণ এই মহাবিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছে। নিম্নে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

রাজনৈতিক কারণ

গভর্নর জেনারেল ডালহৌসি ছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তার সময়ে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাঁতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলী প্রভৃতি অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে দেখা যায়। এই স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারতো না। তারা সুযোগ বুঝে এই নীতির মাধ্যমে কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্রকে সাম্রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পাশাপাশি রাজা বাজিরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ব্রিটিশের অনুগত মিত্র অযোধ্যার নবাবও এই আগ্রাসন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পরেননি। অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়েছিল। এসব ঘটনায় জমিদার থেকে শুরু করে স্বদেশী রাজারা অনেক ক্ষেপে গিয়েছিলেন ব্রিটিশদের উপর। অন্যদিকে ডালহৌসি নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার পর পর দিল্লির সম্রাট পদ বিলুপ্ত করেন। সম্রাট পদ থেকে বঞ্চিত দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও এর ফলে চরম ক্ষিপ্ত হন।

অর্থনৈতিক কারণ

চরম অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা দিয়ে শুরু হয়েছিল বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা অরাজকতা শুরু হয়। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল। ক্ষমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় কৃষি ও শিল্পকে। পাশাপাশি দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে পাশ করা হয় হঠকারি সব আইন। এই আইনগুলোর প্রয়োগের ফলে অনেক বনেদি জমিদার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তারা সুযোগ বঞ্চিত হয়ে সামাজিকভাবেও হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। অন্যদিকে কোম্পানি পলাশী যুদ্ধের পর এ অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ, সোনা রূপাসহ মূল্যবান সম্পদ ব্রিটেনে পাচার করে। এর ফলে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। নানা স্থান থেকে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশরা। সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রচলন, দেশীয় রাজ্য গ্রাস এবং নতুন চাকুরি আইন প্রবর্তিত হয়। ফলে দেশের অনেক মানুষ বেকার ও কর্মহীন হয়ে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানির শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা কোম্পানি শাসন বিরোধী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আর সিপাহী জনতার রোষ এক্ষেত্রে শেষ প্রদর্শনী হয়ে দেখা দেয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

১৮ শতকের শেষাংশে এবং ১৯ শতকের প্রথমভাগে পাশ্চাত্যের প্রভাব, কোম্পানির সমাজ সংস্কার প্রভৃতি এক অর্থে কিছুটা জনকল্যাণমূলক ছিল। তার পরেও জাতীয়তাবাদী ও রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলিম সমাজের কেউই এটা সেভাবে মেনে নিতে পারেন নি। ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন এগুলো ছিল পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত। এ ধরণের সিদ্ধান্তগুলো হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মানুষকে বিচলিত করে তোলে। ফলে তারা ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

সামরিক ও প্রত্যক্ষ কারণ

সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে নানা বৈষম্য ছিল। বিশেষত, পদবি, বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধাও ছিল বেশ কম। অন্যদিকে পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল নানা দিক থেকে। তার উপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল যা একটা পর্যায়ে এসে দাবানলের রূফ নেয়।

সিপাহী বিপ্লব তথা তখনকার বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল; সমুদ্র পাড়ি দিলে ধর্ম নষ্ট হয়। কিন্তু হিন্দু সিপাহিদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতের বাইরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। তখন সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহার করা হচ্ছে। আরও প্রচার করা হয় যে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই গুজবের এক পর্যায়ে দুই ধর্মের সৈন্যরা ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা নানা স্থানে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

ইংরেজদের নানা অরাজকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে উঠেঠিল পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী। দ্রুত এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল মিরাট, কানপুর পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। ফলে এক পর্যায়ে এসে এই আন্দোলন অনেকটা সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছিল। সবমিলিয়ে আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা

বিপ্লবীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে সিপাহী জনতার এই বিদ্রোহ দমনে উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। বাস্তবে অনেক নিষ্ঠুর এবং অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করা হয় বিপ্লব। এই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত সৈনিকদের বেশির ভাগ যুদ্ধে সরাসরি শহিদ হয়েছিলেন। তাদের যারা পরাজিত বা বন্দী অবস্থায় ধরা পড়েন তাঁদের সরাসরি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। বিপ্লব ব্যর্থ হলে শেষ মুঘল সম্রাট সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন, মায়ানমার) নির্বাসন দেয়া হয়। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধের পরাজয় আসন্ন দেখে আগুণে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। সাধারণ সৈনিক বিপ্লবীদের উপর নেমে এসেছিল অমানবিক নির্যাতনের খড়গ। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের আশেপাশের অনেক গাছে সরাসরি অনেকদিন ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক বিপ্লবীর লাশ। এভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ–

১. বিপ্লবী সৈনিকদের সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং একক নেতৃত্বের অভাব ছিল।
২. তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও রসদের অভাব শেষ পর্যন্ত আন্দোলন সফল হতে দেয়নি।
৩. ইংরেজদের থেকে সুবিধাভোগী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি এখানে অনেকটাই নীরব ছিল। দেশের অধিকাংশ রাজা, জমিদার, সৈন্যদের একটি অংশের অসহযোগিতা একে ব্যর্থ করে দেয়।
৪. ইংরেজদের উন্নত সামরিক কৌশল, উন্নতমানের অস্ত্র, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের জয়ী করেছে।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব

১. অীভষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম না হলেও ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে পুরোপুরি ব্যর্থ বলা যাবে না। বস্তুত এর ফলেই ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটেছিল।
২. ব্রিটিশ সরকার ও পার্লামেন্টের হাতে ভারত শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।
৩. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়েছিল।
৪. নতুন ঘোষণা পত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৫. ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বড় গুরুত্ব হচ্ছে এরপর থেকে বিদ্রোহ আর থেমে থাকেনি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ নতুনভাবে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। নানা স্থানে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে ভারতবর্ষের রাজনীতি। এইসব মিলিত আন্দোলনের ফল হিসেবেই ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণসমূহ নিয়ে শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করুন।**

সারসংক্ষেপঃ

১৮৫৭ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে কোম্পানি সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা, অনুসৃত নীতি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আর ক্ষোভের সৃষ্টি করে, তারই বহি:প্রকাশ এই সংগ্রাম। নানা কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। তবে এর ফলে ভারতে একশ বছরের কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। এটি ভারতের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয় কত সালে?
(ক) ১৮৫৭ (খ) ১৮৮৫ (গ) ১৯০৫ (ঘ) ১৯৪৭

২। এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে মিশ্রিত ছিল– (অনুধাবন)
i) গরুর চর্বি ii) মহিষের চর্বি iii) শুকরের চর্বি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল–
i) নেতৃত্বের অভাব ii) বিচ্ছিন্ন আন্দোলন iii) উন্নত সমরাস্ত্র ও সুসজ্জিত বাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে করা কলিঙ্গ যুদ্ধ, সম্রাট অশোকের চিন্তার জগতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার তথা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ নীতি পরিহার করেন।

৪। উদ্দীপকে সম্রাট অশোকের রাজ্য বিস্তার নীতি পরিহারের সাথে ভারত ব্রিটিশ শাসনামলে কার ঘোষণার মিল দেখা যায়?

(ক) রাজা পঞ্চম জর্জ (খ) রানী ভিক্টোরিয়া (গ) রানী মেরী (ঘ) রাজা ২য় চার্লস

৫। উক্ত ঘোষণার পর ভারতে

i) ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় হয় ii) স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হয় iii) ভারতীয়, ব্রিটিশ সমঅধিকার নিশ্চিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ইকবাল ও শাহিন মামার সাথে বাহাদুর শাহ পার্কে বেড়াতে আসে। মামা জানান যে এ পার্কটি এদেশের এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের সাক্ষী, চাচার বক্তব্য শুনে নীনা এ ঘটনার জন্য বিদেশী শাসনের সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে দায়ী করে। অপরদিকে মীরা মনে করে ঐ সংগ্রাম দানা বেধেঁছিল দেশের শিল্প কারখানা ধ্বংস হওয়ার কারণে।

ক. মঙ্গল পাণ্ডে কে ছিলেন? ১

খ. এনফিল্ড রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগ্রামটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. ১৮৫৭ সালের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য অর্থনৈতিক কারণই মূলত দায়ী– ব্যাখ্যা লিখুন। ৪

পাঠ-৮.৬ বাংলায় সংস্কার আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলার সংস্কার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- রাজা রাম মোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে কি ভূমিকা রেখেছেন তা জানবেন।

	মূখ্য শব্দ	**রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী**

ভূমিকা: আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সে রক্তক্ষয়ী ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি:) প্রভাব এসে পড়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। এ সময়ে বাংলার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরাই বাংলায় 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের সূচনা করেন। এই সময়ে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। বাংলার সর্ব ক্ষেত্রে দেখা দেয় পরিবর্তনের বিরাট সম্ভাবনা, যা ইঙ্গিত করে এক নবযুগের। এই নবযুগের জন্ম দিয়েছিলেন বাংলার একদল শিক্ষিত তরুণ যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বের প্রভাবে দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্রবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হতে থাকে। নবজাগরণের প্রভাবেই দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ভিত রচিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত বাঙালিকে তথা ভারতীয়দের স্বাধীনতার পথে ঠেলে দেয়।

রাজা রাম মোহন রায়

উনিশ শতকে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরণের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। এই পরিণতিতে জন্ম হয় নতুন মত (ব্রাহ্মধর্ম ও নব হিন্দুবাদ), নতুন শিক্ষা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির। এভাবেই উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলায় প্রথম নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁসের' উদ্ভব ঘটে। ফলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা হয়ে উঠে আধুনিক চিন্তাচেতনার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালি পরিণত হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারকবাহকে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে আধুনিক মানুষে পরিণত হন। তাছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাও আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। এ সময় বাংলার প্রবাদ পুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহন আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সুফি মতবাদে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী রামমোহন কিছুকাল তিব্বতে বসবাস করে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বেদান্তসূত্র বেদান্তসারসহ উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'তুহফাত-উল-মোয়াহিদ্দীন' (একেশ্বরবাদ সৌরভ) 'মানাজারাতুল আদিয়ান' (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা)। হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী', 'মিরাত-উল-আখবার' ও 'ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন' নামে তিনটি পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন। রাজা রামমোহন তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা পর্যবেক্ষণ করেন। নিজ চিন্তাধারার আলোকে নতুন

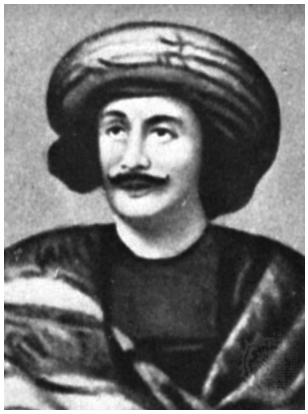
রাজা রামমোহন রায়

সমাজ গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি। তখনকার হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করে তিনি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন। তার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ছিল। রাজা রামমোহন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'এ্যাংলো হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ইংরেজি, দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। এদেশবাসীকে সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদরাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য আবেদন করেন। ১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন ডিরোজিও। তিনি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ডিরোজিও তাঁর স্কুল শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ মানবতাবাদী চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই শিক্ষকের আদর্শ ধারণ করে। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ইতিহাস, ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ডিরোজিওর অনুসারী ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা দেশবাসীকে বার বার এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। তরুণ সমাজের পুরোনো ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিতে ডিরোজিও কর্তৃক ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'একাডেমি এ্যাসোসিয়েশন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একাডেমির তরুণদের এই শিক্ষা দেয়া হয় যে যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান। নতুন চিন্তাধারায় প্রভাবিত তরুণরা সনাতনপন্থী হিন্দু এবং গোঁড়াপন্থী খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠে। ডিরোজিও এবং তার ছাত্রদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকাতেও সমাজ, ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক লেখা প্রকাশিত হয়। যে কারণে তারা রক্ষণশীল মহলের আক্রমণের শিকার হতে থাকেন বারবার। বাংলার 'রেনেসাঁস' যুগের এই প্রতিভাবান তরুণ মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পাণ্ডিত্য, শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার জন্ম ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তার বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়, মা ভগবতীদেবী। দারিদ্রের কারণে শৈশব থেকে শিক্ষাজীবন তেমন সুখকর ছিল না তাঁর। কথিত আছে ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার গ্যাস বাতির নিচে দাড়িয়ে-বসে পড়ালেখা করতেন। তিনি ইংরেজি সংখ্যা গণনা শিখেছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসার সময়, রাস্তার পাশের মাইল ফলকে লেখা সংখ্যার হিসেব গুণতে গুণতে। অসাধারণ মেধা আর অধ্যবসায়ের গুণে তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত, স্মৃতি, অলঙ্কার শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। এ জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। তিনি একজন সফল সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। দেশে প্রচলিত নানা ধরণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। উদার ও সংস্কারমনা বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে প্রচলিত, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সতীদাহ প্রথা, কন্যা শিশু হত্যাসহ সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহতকারী, মানবতা বিরোধী সব ধরনের অশুভ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন পরিচলনা করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রণয়নে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৮৯১ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ

ভারতীয় মুসলমানদের জন্য চরম হতাশার কাল হিসেবে ১৯ শতকের কথা বলা যায়। বিশেষ করে এসময়ে মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করে। তারা ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বিমুখ হওয়ার কারণে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে দারিদ্রের নিম্নতম ধাপে নেমে আসে। এই অধঃপতিত অবস্থা ও দুর্দিনে যে সব মনীষীর আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আসে নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে কোলকাতা মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। এরপর ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। আবদুল লতিফ প্রথম বারের মত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চালান। তিনি এর প্রয়োজন এবং এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মুসলমানদের ইংরেজ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শীর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কোলকাতা মাদরাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু ও বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদরাসা স্থাপন করেন। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুহসিন ফান্ডের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যয় হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ। বলতে গেলে তার প্রচেষ্টায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায় নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল।

সৈয়দ আমির আলী

১৯ শতকের শেষভাগে এসে বাংলার মুসলিম সমাজের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন সৈয়দ আমির আলী। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করতে চেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করতে চেয়েছেন। সৈয়দ আমির আলী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের লিঙ্কস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এরপর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। বাংলা তথা ভারতে তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সৈয়দ আমির আলী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আমির আলী কোলকাতা মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা এবং করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন। মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রদূত আমির আলী ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হচ্ছে– *'The Spirit of Islam'* এবং *'A Short History of the Saracens'*। এতে ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সৈয়দ আমির আলী ১৯২৮ সালে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

বেগম রোকেয়া

বাংলাদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বেগম রোকেয়া ছিলেন অগ্রদূত। ব্রিটিশ আমলে নারীরা ইংরেজ আমলে বেশ পিছিয়ে ছিল। তারা সব ধরনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য

একরকম নিষিদ্ধই ছিল। সমাজ ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। মুসলমান মেয়েদের এই বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যিনি আহবান জানান তিনি বেগম রোকেয়া। এই মহীয়সী নারীর জন্ম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। মায়ের নাম মোসাম্মৎ বাহাতন্‌নেসা সাবেরা চৌধুরী। ঐ অঞ্চলে সাবের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং রক্ষণশীল। মেয়েরা ছিল খুবই পর্দানশিন। বেগম রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ইবরাহিম সাবের এবং বড় বোন করিমুন্নেসার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তার সাহিত্য চর্চার বিষয়বস্তুও ছিল নারী সমাজকে নিয়ে। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারী সমাজের অবহেলা– বঞ্চনার করুণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন। যা উপলব্ধি করেছেন, তা-ই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। তিনি নারীদের করুণ দশা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা প্রভৃতি স্পষ্টভাবে দেখাতে চেয়েছেন সাবলীল লেখনীর মাধ্যমে। বেগম রোকেয়ার লিখিত গ্রন্থ অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতিতে সে চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিবাহিত জীবনে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে জ্ঞান চর্চায় উৎসাহ লাভ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জীবনের বাকি সময় নারী শিক্ষা আর সমাজসেবায় ব্যয় করেন। তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নিত হয়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলার নারী জাগরণের এই অগ্রদূত ১৯৩২ সালে কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	**নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলীর জীবন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন।**

সারসংক্ষেপ :

আঠারো শতকে বাংলায় 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের সূচনা হয়। এই সময়ে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। তখনকার নবযুগের জন্ম দিয়েছিলেন বাংলার একদল শিক্ষিত তরুণ যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বের প্রভাবে দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্রবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হতে থাকে। অন্যদিকে নারীমুক্তির জন্য কাজ করেন বেগম রোকেয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এ্যাংলো হিন্দু কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞানমূলক)
ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) রাজা রামমোহন রায় গ) হাজী মুহম্মদ মুহসিন ঘ) স্যার সৈয়দ আহমদ

২। রাজা রামমোহন আত্মীয়সভা গঠন করেন কেন? (অনুধাবন)
ক) পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য খ) সামাজিক সংস্কার সাধন কল্পে
গ) ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের জন্য ঘ) জনগণকে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য

৩। ডিরোজিও কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞানমূলক)
ক) একুশ খ) বাইশ গ) তেইশ ঘ) চব্বিশ

৪। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে নিচের কোন নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত?
ক) রাজা রামমোহন রায় খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ) হেনরী লুই ডিরোজিও ঘ) প্যারিচাদ মিত্র

৫। বেগম রোকেয়া কোন জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন? (জ্ঞানমূলক)
ক) ভাগলপুর খ) রংপুর গ) বগুড়া ঘ) দিনাজপুর

৬। বেগম রোকেয়ার সময়কালে মেয়েরা কেমন ছিল? (অনুধাবন)

ক) উগ্র মানসিকতা সম্পন্ন খ) লাজুক প্রকৃতির গ) অত্যন্ত পর্দানশীন ঘ) ভীরু প্রকৃতির

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

করটিয়া গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হঠাৎ বদলে যাচ্ছে। কয়েকজন শিক্ষিত তরুণ সেখানকার সমাজ বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। সাব্বির, মাসুম, ইফতেখার, মোহাইমিন এবং সুশান্ত এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে নারীদের নানা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে নাবিলা। ব্রিটিশ আমলে এমনি অনেকের ভূমিকায় বদলে গিয়েছিল বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। উদ্দীপকটি পড়ে উত্তর দিন–

১. বাংলার নবযুগে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা কি ছিল? ১

২. ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট সম্পর্কে কি জানেন? ২

৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩

৪. নারী মুক্তিতে বেগম রোকেয়ার অবদান কি? ৪

পাঠ-৮.৭ বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফকির সন্ন্যাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- তিতুমীরের নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা বলতে পারবেন এবং
- ফরায়েজি মতবাদ হাজী শরিয়ত উল্লাহর সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমীর, নীল বিদ্রোহ ও ফরায়েজি আন্দোলন**

ভূমিকা: বাংলার অভাবী কৃষকের জীবনে প্রাচুর্য ছিল না কখনও। তারা কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করতে পারত কোনভাবে। কিন্তু সে অবস্থাও নষ্ঠ হয় ১৭ শতক থেকে। ১৭ ও ১৮ শতকে ইংরেজ বণিক শ্রেণির আগ্রাসন কেড়ে নিতে থাকে বাংলার কৃষকের মুখের হাসি, তাদের আনন্দ উৎসব। ইংরেজরা শুরুতে ধ্বংস করেছিল গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প, তারপর তাদের নজর পড়ে এদেশের উর্বর জমির উপর। অতিরিক্ত অর্থের লোভে ভূমি রাজস্ব আদায়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। যে পরীক্ষার নিষ্ঠুর বলি হয় বাংলার কৃষক, সাধারণ মানুষ। ফলে তীব্র শোষণে অসহায় কৃষক সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এ বিদ্রোহ ক্রমাগত চলতে থাকে আঠারো শতকের শেষাবধি থেকে ঊনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। এর সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত ঘটে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের। যা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেয়।

ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ

ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল বাংলার সাধারণ অধিবাসী। এরা ছিল হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক একটি দল, যারা সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সারা বছর দেশের একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো। ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে উভয় গোষ্ঠি পরিচিত ছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিদ্রোহী হতে এবং অস্ত্র ধারণ করতে হয়। বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ। আঠারো শতকের শেষার্ধে এই বিদ্রোহের শুরু। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ চলতে থাকে। বাংলার নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চেয়েছিলেন। তখন তার ডাকে সাড়া দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা যুদ্ধ করেছিল। পরে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম পালিয়ে গেলেও ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে নবাবকে সাহায্য করার কারণে ইংরেজরা তাদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখে। বাংলার ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের রীতি অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব, তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষে সারা বছর তাদের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। অন্যদিকে তারা নিজেদের সাথে নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের হালকা অস্ত্র রাখতেন। প্রথম দিকে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিলেন অনেকটাই স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করলে তা এক পর্যায়ে সংঘাতে রূপ নেয়। ১৭৬০ সালের দিকে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহ সারা উত্তর বাংলায় ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। এ অঞ্চলে ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহী ফকির-সন্ন্যাসীদের বহু সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহীরা অনেক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা

মজনু শাহের বিদ্রোহ

করে এবং কোম্পানির বহু কুঠি লুঠ করে। অন্যদিকে ফকির মজনু শাহর যুদ্ধ কৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি, অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবানশাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকির।

তিতুমীরের সংগ্রাম

মীর নিসার আলী তথা তিতুমীর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের (তাহরিক-ই-মুহম্মদীয়া) জোয়ার চলছিল। পশ্চিম বঙ্গের বারাসাত অঞ্চলে তিতুমীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ১৯ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের সঠিক পথ নির্দেশ করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার ওয়াহাবিরাও তিতুমীরের নেতৃত্বে একই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত 'তাহরিক-ই-মুহম্মদীয়া' আন্দোলন বা ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তিতুমীর হজকরার জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। তিনি ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে এসে ধর্মীয় সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান, বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। ফলে জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের উপর নানা ধরণের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাদের প্রতি নানা নির্যাতনমূলক আচরণ শুরু করে। প্রথম দিকে তিতুমীর এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন।

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তিতুমীর ও ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন ইতিহাস খ্যাত তাঁর 'বাঁশের কেল্লা'। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমীরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উঠে শাসক-শোষক, জমিদার শ্রেণি। জমিদারদের প্ররোচনায় ইংরেজ সরকার তিতুমীর এবং তার অনুসারীদের দমনের জন্য বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজেন্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তারা তিতুমীরের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। ১৫ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও বহু আহত হয়। এক পর্যায়ে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পাঠানো ইংরেজ বাহিনীও তিতুমীরের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তিনি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের বিরুদ্ধে বিশাল সেনা বাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমীরের নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমীরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে শহীদ হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এ ভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। এই যুদ্ধে তিতুমীরের ৫০ জন অনুসারী নিহত হন। গোলাম মাসুমসহ ২৫০ জনকে বন্দি করা হয়। পরে এক প্রহসনমূলক বিচারে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

নীল বিদ্রোহ

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বিশেষ করে ১৮ শতকে নীল ব্যবসা খুবই লাভজনক হয়ে উঠেছিল। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা বাংলার কৃষককে নীল চাষে বাধ্য করে। নীল চাষের জন্য নীলকররা কৃষকদের সবথেকে উৎকৃষ্ট জমিটাই বেছে নিতো। কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রীম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশ পরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো। ফলে এই সব অঞ্চলের মানুষ ধীরে ধীরে এক দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। তাছাড়া

প্রথম দিকে ইংরেজরা চাষিদের বিনামূল্যে নীল বীজ সরবরাহ করা। পরের দিকে তা বন্ধ করে দিলে নীল চাষ কৃষকদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারা চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। এ অবস্থায় নীলকররা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে অবাধ্য নীল চাষিকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। ফলে নীল চাষিদের বিদ্রোহ হয়ে ওঠে সময়ের দাবি, চরম অত্যাচার আর শোষণে বিপর্যস্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এই সব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীল চাষিরাই।

বাংলার এ অঞ্চলে যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেনী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলীতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই। স্থানীয় পর্যায়ের এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। কৃষকরা নীল চাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপদেশও অগ্রাহ্য করে। এদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীল চাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথম বারের মতো বাংলার সংগ্রামী বিদ্রোহী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার 'ইন্ডিগো কমিশন' বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে কৃত নানা সংস্কারের প্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তিকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এদেশে নীলচাষ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ফরায়েজি আন্দোলন

ফরায়েজি শব্দটি আরবি 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যাঁরা ফরজ পালন করে তারাই ফরায়েজি। আর বাংলায় যাঁরা হাজী শরিয়ত উল্লাহর অনুসারী ছিলেন, ইতিহাসে শুধু তাদেরকেই ফরায়েজি বলা হয়ে থাকে। শরিয়ত উল্লাহ যে ফরজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অবশ্যপালনীয় (ফরজ) মৌলনীতি। এই মৌলনীতিগুলো হচ্ছে– ঈমান বা আল্লাহর একত্ব ও রিসালাতে বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য হাজী শরিয়ত উল্লাহ মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পরেননি। শরিয়ত উল্লাহ ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' অর্থাৎ বিধর্মীর রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি বিধর্মী বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ

বাংলার শোষিত, নির্যাতিত দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতী, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। শরিয়ত উল্লাহর উপর দরিদ্র জনগোষ্ঠির আস্থা, বিশ্বাস এবং তাঁর নেতৃত্বগুণ নিম্নশ্রেণির জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকে এবং নানা ধরনের কর আরোপ করে। তিনি প্রজাদের অবৈধ কর দেয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন এবং জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নেন। দেশ জুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি নুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন। জমিদার শ্রেণি নানা অজুহাতে ফরায়েজি প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে শরিয়ত উল্লাহ প্রজাদের রক্ষার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তার উপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হাজী শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পরে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর যোগ্যপুত্র মুহম্মদ মুহসিন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার মতো পন্ডিত না হলেও তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শান্তিপ্রিয় নীতি বাদ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। ফরায়েজিদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি নিজে লাঠি চালনা শিক্ষা লাভ করেন। পিতার আমলের লাঠিয়াল জালালউদ্দিন মোল্লাকে সেনাপতি নিয়োগ করে এক সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। এখানে উল্লেখ্য ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলো নীল চাষের জন্য ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং এই

অঞ্চলগুলোতে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাও ছিল দুঃসহ ফলে কৃষকরাও হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী। দুদু মিয়া তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন করেছিলেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল লিখুন।**

সারসংক্ষেপ :

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মানুষ প্রথম সোচ্চার হয়েছিল নানাবিধ সামাজিক সংস্কার ও প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। প্রাথমিক পর্বে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক-ধর্মীয় প্রথা ও কুসংস্কার বন্ধে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা। এরপর অধিকার আদায়ের নিমিত্তে আন্দোলন শুরু করেছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী। এমনি অনেক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় শুরু হয়েছিল ভারত ছাড় আন্দোলন, যার চূড়ান্ত পরিণতি স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ফকির সন্যাসী বিদ্রোহ কতদিন চলেছিল? (সময়কাল অনযায়ী)
ক) ১৭৬০ থেকে ১৭৭১ খ) ১৭৬০ থেকে ১৮০০ গ) ১৭৭৭ থেকে ১৮০০ ঘ) ১৭৮৭ থেকে ১৮০০ খ্রিঃ

২। ফকিরদের বিদ্রোহী দলের নেতা কে ছিলেন–
ক) বলাকি শাহ খ) চেরাগ আলী শাহ গ) মজনুশাহ ঘ) মাদার বকস

৩। তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের নাম কী?
ক) তাহরিক-ই-মুহাম্মদিয়া খ) ফরায়েজি গ) খিলাফত ঘ) ওয়াহাবি

৪। তিতুমীরের দুর্গ কিসের তৈরি ছিল? (অনুধানব)
ক) ইটের খ) মাটির গ) বাঁশের ঘ) টিনের

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম শিকদার ২০১৬ সালে রক্ত ঝরা মার্চের এক শিক্ষার্থী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন মুক্তিযোদ্ধারা কঠিন আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছে। তারা ইতিহাসের একজন বীর যোদ্ধার আত্মত্যাগ থেকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা লাভ করেছে সেই যোদ্ধা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন নিজস্ব চিন্তায় তৈরি কেল্লা তৈরি করে। আর ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বাঙালি শহীদ হিসেবে আজও অমর হয়ে আছেন।

ক. কোন গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন? ১
খ. তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে উদ্দীপকের সাথে মিল রেখে পাঠ্য বইয়ের সবচাইতে বিখ্যাত যোদ্ধাকে তুলে ধরুন। ৩
ঘ. সকল স্বাধীনতা সংগ্রামে তার আত্মত্যাগ হবে অনুপ্রেরণার উৎস- এর সপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-৮.৮ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখন ও কেন প্রতিষ্ঠিত হয় জানতে পারবেন।
- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় কাদের ভূমিকা প্রধান ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কংগ্রেসের প্রাথমিক আদর্শ ও কর্মসূচি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**কংগ্রেস, 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন', ভারত সভা ও লর্ড লিটন**

ভূমিকাঃ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশের সময়টা ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের ঊষালগ্ন। ব্রিটিশ নীতি ও শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে। ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ও পরে কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে। এ সবের উদ্যেগ নিয়েছিলেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তবে তাদের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হতে দেখা যায় এদেশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্যদেরও। এক বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। ভারতীয় জনগণের নায্য অধিকার আদায়ের জন্য জনমত গঠন ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। কিন্তু এসব সমিতি শিক্ষিত অভিজাত ও জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকায় মধ্যবিত্ত বা সাধারণ জনগণের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনুকরণে মুম্বাই ও মাদ্রাজে অনুরূপ সংগঠন গড়ে উঠে। শাসন সংস্কারের মাধ্যমে দেশ শাসনে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি ও তাদের নায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এ সব প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

বাংলার নেতা সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত সভা নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সদ্ভার বজায় রাখা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করেন। উল্লেখ্য, এ সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত কলকাতায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকুরীসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন যখন চলছিল সেই সময়ের মধ্যেই ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লিটন ভাইসরয় হয়ে আসেন। তাঁর সময়কালের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপের দরুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সসীমা একুশ থেকে উনিশে আনা হলে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে আগ্রা, দিল্লি, আলীগড়, লাহোর, কানপুর, বেনারস ও অমৃতসরসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রতিবাদ সভা হয়। এ বিক্ষোভের পরপরই শুরু হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এ আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছিলেন। সরকারের বর্ণ বৈষম্যমূলক অস্ত্র আইন, সাম্রাজ্যবাদী আফগান যুদ্ধ, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের জাঁকজমকপূর্ণ দিল্লি দরবার ইত্যাদিও অসন্তোষের কারন হয়েছিল। লর্ড রিপনের সময়কার ইলবার্ট বিল নিয়ে বিতর্ক ধীরে ধীরে একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। এ বিতর্কের ফলে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে এক নিদারুন বর্ণ বৈষ্যম্যের সূত্রপাত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের এক আইন বলে ভারতে ইংরেজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিচারকার্যে শুধুমাত্র ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ ক্ষমতা পাবেন বলে স্থির হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন সদস্য সি.পি. ইলবার্ট প্রস্তাব করেন যে, ভারতের প্রেসিডেন্সি শহরগুলোর ন্যায় অন্যান্য স্থানেও ভারতীয় সেসন জজরা ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারবেন। এটা ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সারা ভারতবর্ষে বিক্ষোভ শুরু করে। সরকার শেষ পর্যন্ত কিছুটা আপোষ করেন এবং স্থির হয় যে ইউরোপীয় আসামীদের বিচারের ক্ষেত্রে জুরী মণ্ডলীর উপস্থিতি লাগবে এবং তাদের অর্ধেক হতে হবে শ্বেতাঙ্গ। বর্ণবাদী এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পটভূমি প্রস্তত করেছিল।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি

শিক্ষিত হিন্দুরা সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ মোহন বসুর নেতৃত্বে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এলবার্ট হলে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে তখন। বিশেষত, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধিরা একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ দিকে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ এবং অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার কিছুটা ভীত হয়। ভারতীয়দের দাবি ও আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করার এবং তাদের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য সরকার মনোযোগী হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এলান অক্টেভিয়ান হিউম ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সহযোগিতায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে শহরে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠা করেন। দুজন মুসলমানসহ সত্তর জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দেয় এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী। বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসের চারটি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছিলেনঃ

১. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা দেশ সেবায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা;
২. জাতি ধর্ম আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করা;
৩. শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যেমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথে বের করা এবং
৪. রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য পরবর্তী বছরের কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রথম জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন। শুরুতে অল্প কয়েকজন মুসলমান এতে যোগদান করেন। কিন্তু এর কর্মসূচি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় পরবর্তী সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সহ প্রমুখ মুসলিম নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের সাথে জড়িত হতে নিষেধ করেন। প্রথম দিকে কংগ্রেস নেতারা প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যপন্থী। ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান হতো। কিন্তু সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ও সহযোগিতার এ নীতি অচিরেই পরিবর্তিত হতে থাকে। কংগ্রেস পরবর্তী সময়ে ভারতের জন্য স্বরাজ বা স্বাধীনতার আন্দোলন করে এবং সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বিরোধী দলে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেও এই কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মত।

শিক্ষার্থীর কাজ	**জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।**

সারসংক্ষেপঃ

ভারতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা এবং আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে দাবি আদায় এর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক দলটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক দল কোনটি?

ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস খ) নিখিল ভারত মুসলিমলীগ
গ) ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ঘ) ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি

২। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কী ছিল?

i. দেশ সেবকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন
ii. ধর্মীয় সংকীণতা পরিহার করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা

iii. আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ভারতীয় কংগ্রেসের ব্যাপারে বিরোধী ব্যক্তিত্ব কে?

ক) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী খ) উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী

গ) স্যার সৈয়দ আহমদ খান ঘ) এলান অক্টাভিয়ান হিউম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটি জাতি ক্রমশই অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। এহেন অধিকার সচেতনতা যাতে বিপথগামী না হয় এজন্য শাসকগোষ্ঠী উক্ত জাতির শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করে। এ সময় শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতায় সর্বপ্রথম একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিছু কাল এ দলটি স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হলেও একটি সম্প্রদায় কোন অধিকার না পেলে তারাও একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে। ইতিহাসে এ নতুন দলটির প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যাপক।

ক. কোন বিভক্তিকে 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' বলা হয়? ১

খ. শিক্ষা ক্ষেত্রে সৈয়দ আমির আলীর অবদান ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. বর্ণিত প্রথম রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠার পটভূমি আপনার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৮.৯ বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রি.): রদ ও প্রতিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল তা জানতে পারবেন;
- কেন বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হল এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন ও
- এতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রদ, হিন্দু-মুসলমান,পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও লর্ড কার্জন**

বঙ্গভঙ্গের পটভূমি:

মুঘল আমলের ১৮৫৪ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' নামে একটি প্রশাসনিক ইউনিট গঠিত হয়েছিলো। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় সংগঠিত দূর্ভিক্ষ ও যথাসময়ে সুষ্ঠ ত্রাণ না পৌঁছানোর কারণ অনুসন্ধানে গঠিত কমিটি মত প্রকাশ করে যে, প্রদেশটির ভৌগোলিক বিশালতাই এই দূর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। কেননা, তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের আয়তন ছিলো এক লক্ষ ঊননব্বই হাজার বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ছিলো সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। ফলে একজন প্রশাসকের পক্ষে এত বড়ো একটি প্রদেশে সুষ্ঠভাবে শাসনকার্য পরিচালনা সত্যই কঠিন ব্যাপার ছিলো। এছাড়াও কমিটি বাংলার প্রশাসনিক উন্নয়নে আরো কিছু সংস্কারের সুপারিশ করে। অবশ্য বাংলা বিভক্তির দাবি অনেক পুরোনো কারণ ইতিপূর্বে স্যার চালস্ গ্রান্ট ১৮৫৩ সালে বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা বলেছিলো। লর্ড ডালহৌসিও ১৮৫৪ সালে বাংলা বিভক্তির পক্ষে মত দেন। এছাড়াও ১৮৬৬ সালে ভারত সচিব লর্ড নর্থকোর্ট প্রশাসনিক দুর্বলতা দূর করে বাংলা প্রদেশের সীমানা রদবদলের কথা বলেন।

একথা ইতিহাস স্বীকার করে যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দান করেছে বাংলা ও বাঙালি জাতি। ১৮৯৮ সালে ভারতের বড়লাট হিসেবে আগমনের অল্পকালের মধ্যেই লর্ড কার্জন বুঝতে পারেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙলি জাতির এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে এবং তাদের উগ্র জাতীয়তাবদী চিন্তা-চেতনা এক সময়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের জন্য বিপদজনক অবস্থায় পরিণত হতে পারে। সুতরাং বাংলা ও বাঙালি জাতিকে দুর্বল করতে 'ভাগ কর শাসন কর নীতি' এর আবারো সফল প্রয়োগ ঘটাতে হবে। অবশ্য বাংলা বিভক্ত করার জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা ছাড়াও লর্ড কার্জনের কাছে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কারণও গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি ১৯০৪ সালে পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন শেষে বুঝতে পারেন যে, ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই বাংলা অবহেলিত হয়ে আসছে। বিশাল বাংলা প্রেসিডেন্সির রাজধানী কোলকাতা হওয়ায় পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসায় বাণিজ্য, যোগাযোগ ও শিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। তাঁর আশা ছিল বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতে পারে।

বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ গঠন:

লর্ড কার্জন তৎকালীন বাংলা প্রেসিডেন্সির পূর্বাঞ্চল ও আসাম নিয়ে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ভারত সচিব ব্রডারিক পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে ১০ জুলাই একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন এবং ১৬ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হবে বলে ঘোষিত হয়। ঢাকাকে এই নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী এবং চট্টগ্রামকে বিকল্প রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এসময় এই প্রদেশের আয়তন ছিলো ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫ শত ৪ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ছিলো প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া:

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ও এর বাস্তবায়ন শুরু থেকেই হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে ছিল। নতুন প্রদেশ বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা একজোট হয়ে কাজ করেন। এমনকি তারা নানা শ্রেণি পেশার মানুষকে বুঝাতে থাকেন যে, বঙ্গভঙ্গ কোলকাতার হিন্দুদের জন্য অভিশাপ বয়ে আনবে। তারা পত্রপত্রিকায়, সভা-সেমিনারে বক্তৃতায় একে বাঙালি বিরোধী,

জাতীয়তাবাদী বিরোধী, বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করতে থাকেন। সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ লাভ করতে থাকে। 'হিতবাদী' পত্রিকায় বলা হয়, বিগত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতির সম্মুখে এরূপ বিপর্যয় আর কখনো আসেনি। ১৩ জুলাই ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'সঞ্জীবণী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বাণীতে কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছিলেন- ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক 'বয়কট' যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। মূলত, বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে জড়িত ছিল কোলকাতার হিন্দুদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা। আইন আদালতসহ নানাবিধ হিন্দু পেশাজীবী মানুষের আয়ের প্রধান উৎস ছিল বাংলা। তাই হিন্দুরা এরকম একটা ফলবান বৃক্ষকে হাতছাড়া করতে চায়নি। এজন্যই তারা প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর না হওয়ার জন্য এবং পরবর্তীতে তা রদ করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে।

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াঃ

বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল বলে মুসলমানরা একে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ছিল। ঢাকায় ছোটলাট হিসেবে আগমন করলে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ লিখেছেন, এর মাধ্যমে নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। জনগণ ক্রমশ বুঝতে পারছে যে, তাদের কল্যাণের জন্যই এই বিভক্তি। পূর্ববঙ্গ মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ায় তারা সরকারের নিকট থেকে বিশেষ বিবেচনা লাভ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও এখানকার দরিদ্র ও বেকার যুবকেরা উপযুক্ত চাকরি পেত না। কিন্তু নতুন প্রদেশে তারা চাকরি পাচ্ছে। সুতরাং পূর্ব-বঙ্গের মুসলমানদের সমর্থন যে, বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যাবে এটাই স্বাভাবিক।

বঙ্গভঙ্গ রদঃ

বঙ্গভঙ্গ কার্যকর না রাখার দাবিতে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া ছিল মুসলমানদের তুলনায় বেশি। তারা কলকাতার বর্ণ হিন্দুদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে, এটা কার্যকর থাকলে তাদের বেশি ক্ষতি হবে। কারণ, নতুন প্রাদেশিক রাজধানীতে অবশ্যই শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং সেখানে নতুন পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। ফলে কলকাতার ব্যবসায়ীদের একক কর্তৃত্ব খর্ব হবে ও মুনাফা কম হবে। আইনজীবীরা দেখলেন, ঢাকায় নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হলে তাদের আইন ব্যবসায় ভাটা পড়বে কারণ তাদের বেশিরভাগ মক্কেলই ছিল ঢাকার জনগণ। এরকম ছোট বড় ক্ষতির কথা চিন্তা করে কলকাতার নানা শ্রেণি পেশার মানুষ গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আবার বঙ্গভঙ্গ এমন এক সময় কার্যকর হয় যার অনেক আগে থেকেই স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের ঘোষণা যেন সেই আন্দোলনে রসদ যোগাল। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে বিপ্লবীরা তাদের সর্বাত্মক এমনকি সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমও শুরু করল। ১৯০৮ সালে এরকমই আন্দোলনে যোগদান করায় প্রাণ দিতে হয় ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি প্রমূখকে। উল্লেখ্য যে, শুরুতে অনেক মুসলমান যুবকও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলো। কিন্তু যখন হিন্দুরা তাদের দেবী কালীর নামে শপথ গ্রহণ করে এবং 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত চালু করে তখন থেকে মুসলমানরা নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। তবে একথা ঠিক যে, ইংরেজরা বিশেষ করে লর্ড কার্জন বাংলা বিভক্তি টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এমন কি নানারকম পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। ফলে হিন্দুদের আন্দোলন ক্রমশ দূর্বল হতে থাকে। কিন্তু ১৯১০ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন ভাইসরয় হিসেবে ভারতে এসে ঘোষণা দেন যে, আগামী বছর ব্রিটিশ সম্রাট ৫ম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ভারতে এসে দিল্লিতে দরবার

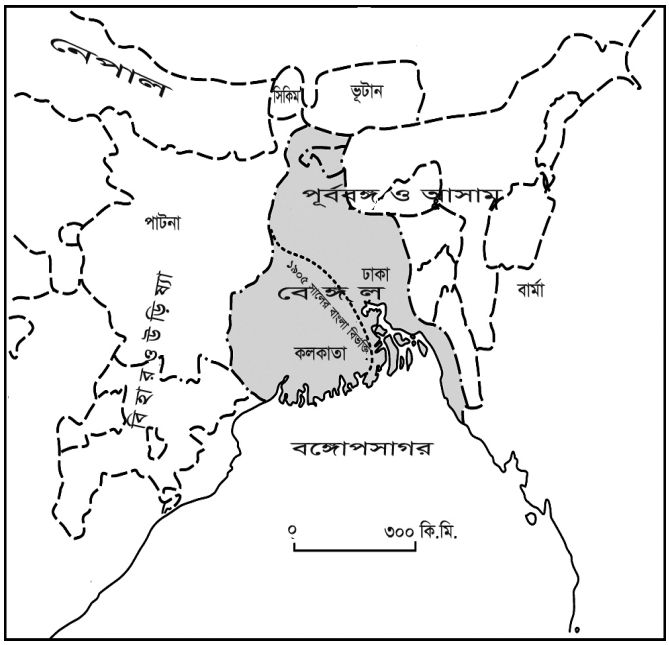

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ

করবেন এবং মীমাংসা করবেন। তাদের আগমন মসৃণ ও সাফল্যমণ্ডিত করতে লর্ড হার্ডিঞ্জ তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের সাথে আপোষ নীতি গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা ১৯১২ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল ও গুরুত্বঃ

বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা যে হিন্দুদের উল্লসিত করবে এটাই স্বাভাবিক। বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা ছিল তাদের আন্দোলনের একমাত্র ও শেষ দাবি। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার ব্রিটিশদের রাজনীতি জ্ঞানের ব্যাপক প্রশংসা করেন। কংগ্রেসের ইতিহাস লেখক পট্টভি সীতারাম লিখেছেন, "১৯১১ সালে কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। আর বঙ্গভঙ্গ রদ করে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনে ন্যায়নীতির পরিচয় দিয়েছে।" অন্যদিকে বঙ্গের মুসলমানরা এতে চরমভাবে ব্যথিত হয়। কারণ মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে উন্নতির যে লাল সূর্য আলো দান করতে শুরু করেছিল তা দুপুরের আগেই অস্ত যেতে বাধ্য হয়েছিল। কেননা, মাত্র পাঁচ বছরে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন যে, এ অঞ্চলের মুসলমানদেরকে তাদের রাজভক্তির প্রতিদানে তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। এরকম মন্তব্য ছিল প্রায় বাংলার প্রতিটি মুসলমানের। তবে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হয়েছিলেন বোধহয় নবাব সলিমুল্লাহ। এব্যাপারে তিনি এত আঘাত পেয়েছিলেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। ক্ষোভে দুঃখে রাজনীতি থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। তবে রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও মুসলমানদের উন্নতির চিন্তা থেকে দূরে থাকতে পারেননি। ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলায় এসে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও পদ্মা নদীর উপর একটি রেল ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। যাইহোক ক্ষুদ্র হলেও ব্রিটিশদের এ ক্ষতিপূরণ পূর্ববাংলার আকাঙ্ক্ষা কিছুটা হলেও পূরণ করেছিল। কেননা পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার স্বাধিকার ও স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বঙ্গভঙ্গের কারণগুলো উল্লেখ করুন।**

কত সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল?	বঙ্গভঙ্গের পর সৃষ্ট নতুন প্রদেশের গঠন উল্লেখ করুন।	বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের কী লাভ হয়েছিল?	বঙ্গভঙ্গের প্রতি হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

সারসংক্ষেপ :

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ ভারতের একটি অন্যতম রাজনৈতিক এবং অনন্যসাধারণ ঘটনা। তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে বড় প্রদেশ ছিল 'বাংলা প্রদেশ'। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে বিভক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ নামে নতুন এক প্রদেশ সৃষ্টি করেন যা ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গের পেছনে কতগুলো যৌক্তিক কারণ থাকলেও এখানে ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির সফল বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেও বর্ণ ও সামন্ত হিন্দুরা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা এটাকে 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' বলে প্রচারণা চালায়। হিন্দুদের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গভঙ্গ কত সালে হয়েছিল?

(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯১৫ (গ) ১৮০৫ (ঘ) ১৯১১

২। বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে?

(ক) ১৯১১ (খ) ১৯২৩ (গ) ১৯০৭ (ঘ) ১৯২১

৩। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরে নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়?

i. ঢাকা ii. জাহাঙ্গীরনগর iii. চট্টগ্রাম

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) ঢাকা (খ) জাহাঙ্গীরনগর (গ) কলকাতা (ঘ) চট্টগ্রাম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বাংলাদেশে মধুপুর নামে বিশাল আয়তনের ঘনবসতিপূর্ণ এক ইউনিয়ন রয়েছে, যেখানে হিন্দু-মুসলিমসহ অসংখ্য মানুষ বসবাস করে। তবে আদমশুমারী অনুযায়ী সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যাই বেশী। সেকারণে এখানকার সবকিছুই তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। ইউনিয়নটি প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে এবং প্রশাসনকি সহায়তার অভাবে অনেকেই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সদিচ্ছা থাকলেও একক প্রশাসনের পক্ষে এতবড় ইউনিয়নের প্রত্যেকের নিকট দ্রুতগতিতে সাহায্যসেবা পৌছে দেয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় প্রশাসনের উচ্চপর্যায় থেকে মধুপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক বিভাজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু সুবিধাভোগীগোষ্ঠীর আন্দোলনের মুখে প্রশাসনকে উক্ত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়।

ক. বঙ্গভঙ্গ কী? ১

খ. বঙ্গভঙ্গ কেন সংঘটিত হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বঙ্গভঙ্গের ফলাফলসহ হিন্দু-মুসলিম প্রতিক্রিয় বিশ্লেষণ করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সূত্রধরে ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ও ফলাফল লিখুন। ৪

পাঠ-৮.১০ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ(১৯০৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- আরো জানতে পারবেন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ফলাফল এবং হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া

	মুখ্য শব্দ	**সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, স্যার সলিমুল্লাহ ও বঙ্গভঙ্গ**

মুসলিম লীগ গঠনের পটভূমি

বিংশ শতাব্দির শুরুতে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের শুভোদয় ঘটে। যা হিন্দুদের মধ্যে আরো আগে সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। মুসলমানদের মধ্যে দল গঠনের মনোভাব জাগ্রত হয় ১৮৮৫ সালে অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম কর্তৃক 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব এবং ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অনুপ্রাণিত করতে পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ঠ একদল শিক্ষিত যুবক জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালীন মুসলমানদের অন্যতম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন এই বলে যে, হিন্দুরা কখনো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপকারে আসবে না। এজন্য তিনি আলীগড়ে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলন বেগবান করার প্রয়াস নেন। যা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত। তিনি ও তৎকালীন অন্যান্য মুসলমানরা বুঝতে সক্ষম হন যে, মুসলমানদের অবশ্যই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ বিরোধী মনোভাব থেকে সহযোগিতা নীতি মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম এবং অধিক কার্যকর একটি মাধ্যম। এর জন্য সবার আগে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন।

শিক্ষা ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাতে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩), সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৯৭৭), ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়াটিক অ্যসোসিয়েশন (১৮৮৮) প্রভৃতি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছিল। উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নে বছরে অন্তত একবার ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হতো। ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন। বঙ্গভঙ্গের গোঁড়া সমর্থক ঢাকার নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ কংগ্রেস সমর্থকদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভ মোকাবেলা করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করেন। হিন্দুরা যেমন বঙ্গভঙ্গ হলে তাদের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে অন্যান্যদের তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ করছে তেমনি ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দুরা কখনই মুসলমানদের উপকারে আসবে না। মুসলমানদেরকেই তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। ৩০ ডিসেম্বর সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন ভিকার-উল-মূলক। এই অধিবেশনেই নওয়াব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের একটি পৃথক দল গঠনের প্রস্তাব করেন এবং তাতে সমর্থন করেন হাকিম আজমল খান। ফলে ঐ অধিবেশনেই আগা খানকে সভাপতি, সলিমুল্লাহকে সহ-সভাপতি, নবাব মহসিন উল মূলক এবং নবাব ভিকার উল মূলক কে যুগ্ম-সম্পাদক করে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নবাব সলিমুল্লাহ এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী দলটির তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। যথা:

ক) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য বাড়ানো এবং সরকারের প্রতি মুসলমানদের কোন রূপ ভুল ধারণা হয়ে থাকলে তা যথাসম্ভব দূর করা।
খ) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানো ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাদের অভাব অভিযোগ ও আশা আকাঙ্ক্ষা সরকারের নিকট পেশ করা।
গ) মুসলিম লীগের উপর্যুক্ত লক্ষ্যের কোন রূপ ক্ষতি সাধন না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

উল্লেখ্য যে, বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার পর পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লীগের আলাদা দুটি শাখা স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামে কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন করতে চৌধুরী কাজেম উদ্দীন সিদ্দিকীকে সভাপতি ও সলিমুল্লাহকে সম্পাদক করে অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। অন্যদিকে ১৯০৯ সালের ২১ জানুয়ারি প্রিন্স জাহান্দার মির্জাকে সভাপতি ও সৈয়দ শামসুল হুদাকে সম্পাদক করে মুসলিম লীগের পশ্চিমবঙ্গ শাখা কমিটি গঠিত হয়।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াঃ

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের টানাপোড়েন সবচেয়ে জোরালোভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। বঙ্গভঙ্গে যেমন হিন্দু নেতারা বিরোধিতা করেছে তেমনি তারা বিদ্রুপের হাসি হেসেছেন মুসলিম লীগ গঠনের সংবাদে। তাদের আশংকা ছিল যে, যদি মুসলমানরা কোন দল গঠন করতে পারে তাহলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁরা আলাদাভাবে মূল্যায়িত হতে পারে। হিন্দুদের দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকাগুলো পরবর্তী দিন বিদ্রুপাত্মক সংবাদ প্রকাশ করে। যেমন- সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কর্তৃক সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় মুসলিম লীগকে "সলিমুল্লাহ লীগ" বলে ঘোষণা করে এবং এটিকে ব্রিটিশ সরকারের ভাতাভোগী ও তাবেদারদের সমিতি বলে আখ্যায়িত করে। এমনকি এটি বেশীদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও প্রদর্শন করা হয়।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

ফলাফল ও পরবর্তীতে প্রভাব

মুসলিম লীগ গঠন মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিল। কেননা এতদিন মুসলমানরা পালহীন নৌকার মতো দিক বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল এবং সেই সাথে সকলের অন্যায় অত্যাচার মাথা পেতে নিতে হচ্ছিল। কিন্তু এখন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য প্লাটফর্ম খুঁজে পেল। তারা রাজনৈতিক দিক থেকে বলীয়ান হবার পাশাপাশি শিক্ষা, অর্থনীতিসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে তাদের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করলো। তারা মুসলিম লীগকে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে গণ্য করতে লাগলো। আবার মুসলিম লীগও মুসলমানদের একমাত্র মূখপত্র হিসেবে সকল কর্ম-কাণ্ড পরিচালিত করতো। যেমন: মুসলিম লীগের প্রচেষ্টার কারণেই হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলন সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ রদ করতে ব্রিটিশ সরকারের ছয় বছর সময় লেগেছিল। তবে মুসলিগ গঠন ছিল ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো বাঁধার প্রাচীর। যেহেতু হিন্দুদের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত ছিল আর এখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হলো ফলে সাম্প্রদায়িকতা আরো ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করলো। মুসলিম লীগের বড়ো সাফল্য ছিল মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থাকরণ। ১৯০৯ সালে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের জন্য মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাশ হয়। মুসলিম লীগের আরেকটি সাফল্য হলো মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করা অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি ধরা হয় ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে উত্থাপিত 'একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা' নামক প্রস্তাবটি। পরবর্তীতে এই প্রস্তাবটি মুসলমানদের গণদাবিতে রূপান্তরিত হয় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে। যার সফল পরিণতি ঘটে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সর্বভারতীয় মুসলিমলীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরুপন করুন।**

সারসংক্ষেপ :

সর্বভারতীয় মুসলিমলীগ ছিল ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন। ব্রিটিশ শাসনের শুরু হতেই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সর্বদিক হতে অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি অবহেলিত ও বঞ্চিত মুসলমানদের দাবি আদায় করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলমানরা কতগুলো সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং ১৯০৬ সালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকার শাহবাগে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯০৬ খ) ১৮৮৫ গ) ১৯৪৮ ঘ) ১৮০৬

২. কংগ্রেস কতসালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৭৮৫ খ) ১৮৮৫ ঘ) ১৯০৫ ঘ) ১৯০৬

৩. কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক) লর্ড কার্জন খ) এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম গ) এ্যালান হিউম ঘ) প্যাটেল

৪. সর্বভারতীয় মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কয়টি?
ক) ৫টি খ) ৭টি গ) ৩টি ঘ) ৮টি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দেশ। সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অধিকার আদায়ের জন্য 'ক দল' নামক একটি রাজনৈতিক দল থাকলেও, মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্য তেমন কোন দল নেই। সে-কারণে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এম এল নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সে অনুযায়ী কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ক) মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় কারা মুখ্য ভূমিকা পারন করেন? ২
গ) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি উল্লেখ কর। ৩
ঘ) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ভারতীয় মুসলিম রাজনীতিতে এর প্রভাব মূল্যায়ন কর ৪

পাঠ-৮.১১ লক্ষ্মৌ চুক্তি (১৯১৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লক্ষ্মৌ চুক্তির পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- চুক্তির ধারাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন হিন্দু-মুসলিম রাজনীতিতে এই চুক্তির গুরুত্ব।

	মুখ্য শব্দ	**হিন্দু-মুসলিম, মর্লি-মিন্টো সংস্কার, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা,স্বায়ত্বশাসন ও স্বরাজ**

১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ চুক্তি ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ সালে রদ হলে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা দেখা দেয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) সময় ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সাহায্য কামনা করলে দৃশ্যপট পালটে যায়। এ পরিবর্তিত অবস্থায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে হিন্দু- মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই উভয় দলের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়ে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। উভয় দল পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে একটি সমঝোতায় পৌছে যা ইতিহাসে লক্ষ্মৌ চুক্তি নামে পরিচিত।

লক্ষ্মৌ চুক্তির পটভূমি : লক্ষ্মৌ চুক্তির পটভূমি তৈরিতে একক কোন ঘটনা ভূমিকা রাখেনি। এর পেছনে রয়েছে বেশ কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘটনা।

মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের সীমাবদ্ধতা

লক্ষ্মৌ চুক্তির পটভূমি তৈরির ক্ষেত্রে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন বেশ খানিকটা ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে করা হয়। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে কংগ্রেসের চরমপন্থীদের দমন এবং মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে। মুসলমানরা তাৎক্ষণিকভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখালেও কিছুদিনের মধ্যে এই আইনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে। ফলে ১৯১০ সালের পর থেকে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় একে অন্যের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে থাকে। এ সময় থেকে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি বন্ধুত্বমূলক মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। একইসঙ্গে তারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরেন।

এলাহাবাদ বৈঠক

১৯১০ সালে মুসলিম লীগের নাগপুর অধিবেশনের পর ১৯১১ সালের জানুয়ারিতে এলাহাবাদে হিন্দু ও মুসলমানদের একটি যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৬০ জন হিন্দু ও ৪০ জন মুসলিম নেতা অংশ গ্রহণ করেন। হিন্দুদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মদন মোহন মারাভিয়া, মতিলাল নেহেরু, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং মুসলমানদের মধ্যে নবাব ভিকার-উল-মূলক,আগা খান,ইব্রাহিম, রহিমৎউল্লাহ, সৈয়দ মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনটি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এ অঞ্চলের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হন। ১৯১৩ সালের এপ্রিলে ঢাকার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে এ কে ফজলুল হক ব্রিটিশ সরকারের মুসলমান স্বার্থবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হবে। তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য মুসলিম লীগের সদস্য হয়েও কংগ্রেসে যোগ দেন।

মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

কিছু সংখ্যক মুসলিম কবি, লেখক ও সাহিত্যিক তাদের সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শিবলি, আকবর, ও ইকবাল। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন আবুল কালাম আজাদের উর্দু ভাষায় প্রকাশিত *আল হেলাল* , জাফর আলী খানের সম্পাদনায় *জামিনদার*, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত মোহাম্মদ আলীর *কমরেড* এবং উর্দু ভাষায় প্রকাশিত *হামদর্দ* পত্রিকা।

ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি

ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ায় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দমননীতিও মুসলমানদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। ১৯১৫ সালে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের আল হেলাল, মাওলানা মোহাম্মদ আলীর *কমরেড* পত্রিকা সরকার বন্ধ করে দেয়। ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্যে মাওলানা মোহাম্মাদ আলী, তার ভাই মাওলানা শওকাত আলী, মাওলানা জাফর আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে অন্তরীণ রাখা হয়। এ সব কারণে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

লক্ষ্মৌ অধিবেশন

হিন্দু ও মুসলিমদের যৌথ সংস্কার পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ১৯১৬ সালে কলকাতার উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করা। লক্ষ্মৌ অধিবেশনের প্রাক্কালে এ কমিটি যৌথভাবে একটি সংস্কার প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করে। ১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩১ ডিসেম্বরে লক্ষ্মৌতে যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই উভয় সম্মেলনে হিন্দু ও মুসলিম যৌথ সংস্কার প্রস্তাবনা গৃহীত হয় যা ইতিহাসে লক্ষ্মৌ চুক্তি নামে পরিচিত।

লক্ষ্মৌ চুক্তির ধারাগুলো নিম্নরুপ

এই চুক্তির প্রধান প্রধান ধারাগুলো নিম্নরুপ:

১. ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস একযোগে আন্দোলন করবে।
২. কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য বিরোধিতা করলে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিল পাস করা যাবে না।
৩. কেন্দ্রিয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা হবে ১৫০ জনের মধ্যে ১২০ জন হবেন নির্বাচিত এবং ৩০ জন হবেন মনোনীত।
৪. নির্বাচিত সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ মুসলিম এবং তারা মুসলিম ভোটার দ্বারা নির্বাচিত হবেন।
৫. গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের অর্ধেক সদস্য ভারতীয় হবেন।
৬. সামরিক বাহিনীতে অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে নিযুক্ত করতে হবে।

লক্ষ্মৌ চুক্তির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লক্ষ্মৌ চুক্তির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম-

ক. কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠা: এতোদিন পর্যন্ত হিন্দু- মুসলিম একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে কাজ করলেও এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। এ চুক্তিটি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ঐক্যের দলিল। হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র কওে সৃষ্ট হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লক্ষ্মৌ চুক্তি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে।

খ. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি নির্মাণ: লক্ষ্মৌ চুক্তি ভারতের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যেমন ঐক্য সৃষ্টি করেছে তেমনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছে। তারা যৌথভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের দাবি জানায়। ফলে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে কিছু রদবদলসহ সরকার লক্ষ্মৌ চুক্তি অনেকটাই মেনে নেয়। এতদসত্ত্বেও কোন সম্প্রদায়ই ব্রিটিশ সরকারের এই উদ্যোগে খুশি হতে পারেনি। তারা স্বরাজ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

গ. স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের স্বীকৃতি লাভ: চুক্তির ফলে মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সত্তা অর্থাৎ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রকাশ্য স্বীকৃতি অর্জন করে। এ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনাধিকার অনুমোদন লাভ করে। এটিকে কেউ কেউ মুসলমানদের জন্য অসম্মানজনক বলে মন্তব্য করলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্যে এটার প্রয়োজন ছিল।

ঘ. অসম্প্রদায়িক রাজনীতির শুভসূচনা: এতাদিন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি চরম সাম্প্রদায়িক পরিবেশ বিরাজ করছিল। এ চুক্তির মাধ্যমে অসম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা হয়। দীর্ঘদিনের রেষারেষির পর এই প্রথম উভয় সম্প্রদায় কাছাকাছি আসার সুযোগ লাভ করল।

সমালোচনা: কোন কিছুই সমালোচনার উর্ধে নয়। লক্ষ্মৌ চুক্তি রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। এ কে ফজলুল হক, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তিলক,ও মুহম্মাদ আলী জিন্নাহ এ চুক্তিকে স্বাগত জানান। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী লক্ষ্মৌ চুক্তি যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক এ দাবীকে উড়িয়ে দেন। তিনি এটাকে শিক্ষিত ও ধনী হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে একধরণের বোঝাপড়া বলে অভিহিত করেন। এভাবে লক্ষ্মৌ চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত থাকলেও এ চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯০৫ সালের পর থেকে ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু- মুসলমান সর্ম্পকের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, এ চুক্তির মাধ্যমে উপমহাদেশের রাজনীতিতে স্বস্তি ফিরে আসে। এ হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**লক্ষ্মৌ চুক্তির পটভূমি আলোচনা করুন।**

সারসংক্ষেপ :

লক্ষ্মৌ চুক্তি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের পর হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক চরম আকার ধারণ করেছিল। এ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু- মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার প্রস্তাব 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. লক্ষ্মৌ চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

ক. ১৯২৬ খ. ১৯১৬ গ. ১৮১৬ গ. ১৯৩৬

২. লক্ষ্মৌ চুক্তির বিপক্ষে ছিলেন

ক. মহাত্মা গান্ধী খ. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী গ. তিলক গ.মুহম্মদ আলী জিন্নআহ

৩. চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রিয় আইন সভায় মুসলিম সদস্য সংখ্যা কত?

ক. ৫০ জন খ. ৪০ জন গ. ১২০ জন গ. ৩০ জন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

ব্রিটিশ শাসিত পূর্ব তিমুরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুটি বিবদমান গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছিল। ব্রিটিশরাও তাদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির আলোকে উভয় দলের মধ্যে তিক্ততা টিকিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু বিবদমান সম্প্রদায় দুটি ব্রিটিশ চাল বুঝতে পেরে, তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা করে এবং নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ফলে একদিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয় অন্যদিকে সংঘাতে লিপ্ত সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

(ক) লক্ষ্মৌ চুক্তি কী? ১

(খ) লক্ষ্মৌ চুক্তির প্রধান উদ্যোক্তাদের নাম লিখুন? ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরের ধারণার আলোকে লক্ষ্মৌ চুক্তির প্রধান শর্তগুলো লিখুন?। ৩

(ঘ) ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে লক্ষ্মৌ চুক্তির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৮.১২ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং
- ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**খলিফা, তুর্কি খিলাফত, অসহযোগ, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস**

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম স্বত:স্ফূর্ত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। এটি এমন এক সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন সারা বিশ্বে সদ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছে। ভারতবাসী আশা করেছিল মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় উপমহাদেশে উদার শাসন নীতি প্রচলিত হবে। কিন্তু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার কারণে এখানে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন গড়ে ওঠে যেখানে হিন্দু মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করে যা ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রূপলাভ করে। যদিও আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি।

খিলাফত আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক ছিল অন্যতম। তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তি (ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স) চরম অবমাননাকর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল খিলাফত বাতিল ঘোষণা করা। তুর্কি সুলতানরা নিজেদের মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে দাবি করতেন। কিন্তু উসমানীয় সালতানাতের অবসান ঘটিয়ে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হলে খিলাফতের অবসান ঘটে। ফলে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর মতই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমরা তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্যের অবসান মেনে নিতে পারেনি। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী আবুল কালাম আজাদ প্রমূখের নেতৃত্বে তুরস্ক বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের ন্যাক্কারজনক ভূমিকার নিন্দা করেন এবং সরকার বিরোধী এক শক্তিশালী আন্দোলনের ঘোষণা করেন। খিলাফতকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ খিলাফতকে টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে আন্দোলন পরিচালিত হওয়ায় এটিকে 'খিলাফত আন্দোলন' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ডঃ আনসারীর নেতৃত্বে 'খিলাফত কমিটি' গঠিত হয় ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর । আর ঐ তারিখটি 'খিলাফত দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯১৯ সালের ১৪ নভেম্বরে এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খিলাফত বৈঠকের প্রথম অধিবেশন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তুরস্কের অখণ্ডতা ও খলিফার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার দাবি করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি না পেলে মুসলমানগণ সরকারের সাথে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করে চলবে। অবশ্য বেশ কয়েকজন কংগ্রেসি নেতাও খিলাফত বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেছিল। মহাত্মা গান্ধীও খিলাফত বৈঠকের একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি সভাপতির ভাষণে খিলাফত বিষয়ে কংগ্রেস সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। একই বছর ডিসেম্বর মাসে মাওলানা শওকত আলীর সভাপতিত্বে খিলাফতের দ্বিতীয় বৈঠক লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত হয় । এ বৈঠকে তুরস্ক ও খলিফার ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব জানানোর জন্য বড় লাট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ধারাবহিকতায় ড. আনসারীর নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলিমদের একটি প্রতিনিধিদল ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে বড়লাটের সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের অভিযোগগুলো তুলে ধরেন। কিন্তু সরকার তাদের নিরাশ করেন এই বলে যে, জার্মানির অনুকূলে অস্ত্র ধারণ করার শাস্তি তুরস্ককে পেতেই হবে।

১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে আহূত খিলাফত সম্মেলন অসহযোগ আন্দোলনের উপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং একটি প্রতিনিধিদলকে লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান, কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। ১৯২০ সালের মে মাসে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সেভার্সের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সংবাদ

প্রচারিত হয়। এ সন্ধির শর্তগুলো এদেশের মুসলমানদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি করে। জুন মাসে খিলাফত কমিটি অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল:

যথা: ১) সরকারি খেতাব ও অবৈতনিক পদ বর্জন করা,
২) সরকারের বেসামরিক পদগুলো থেকে ইস্তফা দেয়া,
৩) পুলিশ ও সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করা
৪) খাজনা বন্ধ করা প্রভৃতি

উপরোক্ত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় গ্রামবাসী খাজনা দিতে অস্বীকার করে। এছাড়াও ব্রিটিশ পণ্য, অফিস আদালত বয়কট করা হয়। ১৯২০ সালের পহেলা আগস্ট বিশালাকারে সারাদেশে হরতালসহ খিলাফত দাবি পালিত হয়। ব্রিটিশ সরকার খিলাফত ও রাওলাট আইন সম্পর্কে অনমনীয় মনোভাব অক্ষুন্ন রাখায় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন ও কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন একীভূত হয়। ফলে এদুটি আন্দোলন মিলে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি, জমিয়ত-ই-উলামা-ই-হিন্দ প্রভৃতি দলের নেতৃত্ব এককভাবে গ্রহণ ও পরিচালনা করেন। আন্দোলন এতই গতিশীল ছিল যে, সারা দেশে ১৯২০ সালেই ২০০ এর অধিক ধর্মঘট সফলভাবে পালিত হয়। গান্ধীজী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ যোগদান করতে থাকে। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গ্রন্থ রচয়িতা অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহর ভাষায়, এ তিনজন (আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও গান্ধী) তখন পরিণত হয়েছিল মুকুটহীন ভারত সম্রাটে। ১৯২১ সালে আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে। কোন কোন জায়গায় অহিংস আন্দোলন সহিংসতায় রূপান্তরিত হয়। ফলে সরকার দমননীতি পুরোপুরি ভাবে প্রয়োগ করতে থাকে। ১৯২১ সালেই মাওলানা মোহম্মদ আলী, মাওলানা আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু প্রমূখকে সহ প্রায় ২০ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঐ বছরই খিলাফত আন্দোলনকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং সেই সাথে দমননীতিকে আরো সম্প্রসারিত করে। ফলে ধীরে ধীরে আন্দোলন ম্রিয়মান হতে থাকে।

খিলাফত আন্দোলনের ফলাফল ও গুরুত্ব

খিলাফত আন্দোলন তার চাহিদা অনুযায়ী পরিণতি লাভ করতে পারেনি। এর বড়ো কারণ হলো- এই দাবিটি সময়োপযোগী ছিল না। কেননা এটি শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মাথা ব্যাথার কারণ ছিল না । এটি ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের সমস্যা। কিন্তু আরবদেশ গুলো থেকে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। আবার যোগ্য নেতৃত্বের অভাবও আন্দোলনকে সফল পরিণতি দেয়নি। কারণ আলী ভাতৃদ্বয় বার বার গ্রেফতার হওয়ায় আন্দোলন পালহীন নৌকার মত দিকবিদিক চলেছিল। তবে ব্যর্থতার জন্য উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা থানায় অগ্নি সংযোগের ঘটনা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে দায়ী করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

ইতিহাসে কোন দেশ কখনই অন্য কোন দেশ বা ব্যক্তির অধীনে থাকতে পছন্দ করেনি। তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ বারবার স্বাধীকার বা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন মুখর হয়েছে। ১ম মহাযুদ্ধের পর একদল ভারতীয় যুবক জার্মানির সহযোগিতায় স্বাধীকার অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার নির্যাতন ও দমনমূলক রাওলাট আইন পাশ করতে উদ্যত হলে অনেক হিন্দু নেতা বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী এটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল চেম্সফোর্ডকে আইন পাশে তার সম্মতি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জেনারেল চেমসফোর্ড গান্ধীর অনুরোধ উপেক্ষা করে রাওলাট আইনে সম্মতি দান করেন এবং তা বলবৎ করেন। ফলে গান্ধী সারা দেশে সত্যাগ্রহ ও গণআন্দোলনের ডাক দেন। গান্ধী তাঁর আন্দোলনে শান্ত, নিরস্ত্র ও অহিংস নীতি গ্রহণ করেন। তথাপিও কোন কোন স্থানে অহিংস আন্দোলন সহিংসতায় রূপলাভ করে। যেমন: পাঞ্জাবের অমৃতসর, গুজরানওয়ালা এবং দিল্লিতে আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠলে তা দমনের জন্য সরকারও কঠোর নীতি গ্রহণ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে অমৃতসরের শাসনভার বেসামরিক থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এর প্রতিবাদে জনগণ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি উদ্যানে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল সমবেত হয়। এই উদ্যানের প্রবেশের একটি মাত্র পথ এবং বহি:র্গমনের জন্য চারটি পথ ছিল। আর চারপাশে অট্টালিকা বেষ্ঠিত ছিল । সহিংসতার আশংকায় জেনারেল ডায়ার এর নির্দেশে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই প্রায় ১০ মিনিট ধরে নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। সরকারি হিসাব মতে এই হত্যাকাণ্ডে ৩৭৯ জন নিহত এবং ১২০০ জন আহত হয়। কিন্তু অনেকের মতে মৃতের সংখ্যা হাজারের উপরে । মূলত ভারতের সর্বত্র আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। তবে একথা ঠিক যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে সারাদেশে তুমুল বিতর্কের

ঝড় ওঠে এবং ইংরেজদের প্রতি দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ সমগ্র ভারতে এক মহাযুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরূপ নৃসংশতার প্রতিবাদে ব্রিটিশ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে, এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য জাতীয় কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। যার সদস্য ছিলেন- মতিলাল নেহেরু, এ. কে. ফজলুল হক, এম আর জয়াকার, চিত্তরঞ্জন দাশ, আব্বাস তৈয়াবজী, মহাত্মা গান্ধী প্রমূখ। উক্ত কমিটি জেনারেল ডায়ারকে দায়ী করে এবং তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করে। কিন্তু তার পরও ভারত সরকার জেনারেল ডায়ারের কার্যকলাপকে সমর্থন দান করে। যাইহোক ভারতবাসী কিন্তু তাদের আন্দোলন থেকে পিছপা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, 'তুরস্ক বাঁচাও, বাঁচাও খিলাফত' এই আন্দোলনের নেতৃত্বে দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল আগেই। কিন্তু ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে মাসে গান্ধী কংগ্রেসের একটি বিশেষ সভায় অসহযোগ আন্দোলনের রূপকল্প ঘোষণা করেন। রূপকল্পের মধ্যে ছিল- সরকারি খেতাব ও সম্মানসূচক উপাধি বর্জন, ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন, রাজ বিচারালয় বর্জন, বিদেশী পণ্য বর্জন ও দেশি পণ্যের বিস্তার ঘটানো ইত্যাদি। এই অসহযোগ আন্দোলনকে ব্যাপকতর রূপদান করতে সারা দেশ থেকে ১ কোটি স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও দেশীয় বস্ত্র প্রসারের নানাবিধ ব্যবস্থা নেয়া হয়। বিদেশী বিদ্যালয়ের পরিবর্তে এদেশীয় পাঠশালা ও বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে উত্তর প্রদেশ, বাংলা বিহার, উড়িষ্যাসহ নানা প্রদেশে প্রায় ৮০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সরকারি গোয়েন্দা ব্যামফোর্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশদের পরিচালিত কলেজে ১৯১৯-২০ সালে যেখানে শিক্ষার্থী ছিল ৫২,৪৮৬ সেখানে ১৯২১-২২ সালে শিক্ষার্থী কমে দাড়ায় ৪৫,৯৩৩ জনে। এরকম এই অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব সরকারি অফিস আদালতসহ নানা জায়গায় প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। সরকারের রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গান্ধী সারা দেশে আন্দোলনের বীজবপন করেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি মুসলমানদের থেকে জোরালো সমর্থন আদায়ের জন্য 'খিলাফত আন্দোলনে' নৈতিক সমর্থন দেন এমনকি বিভিন্ন জনসভায় মুসলমানদের পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ও গান্ধীর আন্দোলনে তাদের সমর্থনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। একারণে ভারতের দুটি জাতি প্রথমবারের মত কোন একটি বিষয়ে আন্দোলনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করে।

গান্ধী তার আন্দোলনের সূচনাতেই এটিকে অহিংস বলে প্রচার করেন। কিন্তু এটি ক্রমেই সহিংসতায় রূপান্তরিত হচ্ছিল। ফলে সরকারও কঠোর হস্তে তা দমন করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দেশে যেকোন প্রকার সভা সমিতি, হরতাল, ধর্মঘট প্রভৃতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। এছাড়াও সরকার গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করেন। এতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও অভিজাতদের গ্রেফতার করা হয়। যেমন-লালা লাজপৎ রায়, মতিলাল নেহেরু, চিত্তবঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী, মাওলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসুসহ প্রায় ২০ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়। এই দমন নীতির ফলে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। একটি দূর্ঘটনা ঘটে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। একটি শোভাযাত্রায় পুলিশ গুলিবর্ষণ করা শুরু করে। কিন্তু পুলিশের দূর্ভাগ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের রসদ ফুরিয়ে গেলে তারা নিরুপায় হয়ে থানায় আশ্রয় নেয় এবং উত্তেজিত জনতা থানায় অগ্নি-সংযোগ করে। ২২ জন পুলিশ সদস্য জীবন বাঁচানোর তাগিদে বাইরে আসলে তাদের সকলকেই পুড়িয়ে মারা হয়। এই ঘটনায় গান্ধী চরমভাবে মর্মাহত হন এবং তিনি বারদৌলি প্রস্তাব অনুসারে অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘোষণা করেন। অবশ্য অনেকে গান্ধীর এই ঘোষণা মেনে নিতে পারেননি। তারা এটাকে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল বলে মনে করেন।

ব্যর্থতার কারণ

অনেকে অবশ্য এই আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য গান্ধীর একক নেতৃত্বকে দায়ি করেছেন। আবার অনেকে এই অসহযোগ আন্দোলনকে মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের সাথে একিভূত করাকে বেশি দায়ি করছেন। তবে একথা ঠিক যে, গান্ধী এটিকে অহিংস ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তারপরও কতিপয় স্থানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। যদি ঐ অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটতো তাহলে হয়তোবা এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অন্য ভাবে ইতিহাসে লিখা হতো।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব

অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব তেমন একটা না থাকলেও এটির সুদূর প্রসারী কিছু প্রভাব অবশ্যই ছিল। সভা সমাবেশ, বয়কট ও হরতালসহ নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে একটি বড়ো সাফল্য অর্জিত হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেস গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হয়। এমনকি মুসলিম লীগও তাদের

জনপ্রিয়তা বাড়াতে সক্ষম হয়। তবে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা ছাড়াই গান্ধী আন্দোলনের অবসান ঘোষণা করলে কংগ্রেসের অন্যতম শক্তিশালী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু খুবই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এমনকি তারা কংগ্রেস থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়ে 'স্বরাজ দল' একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ফলে এতে করে কংগ্রেস ক্ষমতা কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। কেননা ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ দল কেন্দ্রিয় আইন সভার ১০১ টি আসনের মধ্যে ৪৫ টি আসনেই জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করুন।**	
খিলাফত আন্দোলন কী?	জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড	তুর্কি খিলাফতের বিলুপ্তির কারণ কী?

সারসংক্ষেপ :

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই মঞ্চে সমাবেত হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন সফল হতে পারেনি। আন্দোলনটি প্রকৃতপক্ষে সফল না হলেও এ আন্দোলনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত হয় তা পরবর্তীকালে বহু আন্দোলনের গতিপথ নির্দেশ করে। প্রাথমিকভাবে ভারতীয় মুসলমান তথা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় খিলাফত আন্দোলন আর হিন্দু সম্প্রদায় তথা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় অসহযোগ আন্দোলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কতসালে শেষ হয়?

ক. ১৯১৪ খ. ১৮১৪ গ. ১৯১৯ গ. ১৯১৮

২. কত সালে 'খিলাফত কমিটি' গঠিত হয়?

ক. ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর খ. ১৯২৯ সালের ২৭ নভেম্বর

গ. ১৯১৯ সালের ১৭ মার্চ গ. ১৯১৯ সালের ১৭ আগস্ট

৩. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে কতজন নিহত হয়?

ক. ৩৭৯ খ. ৪৭৯ গ. ৬৭৯ গ. ৩৮৯

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জালালাবাদ ইউনিয়ন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী ইউনিয়ন। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস হলেও মূলত হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কুটকৌশলের কারণে তারা নানা ধরণের সাম্প্রদায়িক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে আসছিল। একপর্যায়ে উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের আলোচনা, সভা-সমাবেশ ও চুক্তির মাধ্যমে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং ইউপি চেয়ারম্যান আর.কে চৌধুরীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেন। একইসাথে আন্দোলনকারীরা জালালাবাদ ইউনিয়নের মেধাবী ছাত্র অমিয় রায়ের উন্নত চিকিৎসার জন্য চেয়ারম্যানের নিকট সম্মিলিত ভাবে দাবি জানান, এই উদ্যোগও আন্দোলনে একটা ভিন্নমাত্রা যোগ করে কিন্তু দু:খজনক হল আন্দোলন চলাকালেই অমিয় রায় মৃত্যুবরণ করে, ফলে আন্দোলনটা ব্যর্থ হয়ে যায়।

(ক) খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন কী ? ১

(খ) খিলাফত কমিটির কর্মসূচিগুলো লিখুন? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লিখুন । ৩

(ঘ) কেন আন্দোলনটি ব্যর্থ হয়েছিল?- ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৮.১৩ বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তাবলী ও গুরুত্ব সম্পর্কে।

	মুখ্য শব্দ	**চিত্তরঞ্জন দাস, শুদ্ধি ও সংগঠন, তাবলীগ ও তানজীম এবং স্বরাজ (পার্টি) দল**

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদনের ক্ষেত্রে যাদের অসামান্য অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন চিত্তরঞ্জন দাস। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হলেও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে বাঙলার শতকরা ৬০ জন মানুষ মুসলমান অথচ সরকারি চাকুরি ও অন্যান্য সংস্থায় তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসরমানদের দাবি অগ্রাহ্য করে এবং তাদের অবমূল্যায়ন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, এদেশের মুক্তির জন্য দরকার হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই সর্বপ্রথম তিনি হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই উদ্যোগের সাথে যারা সহমত পোষণ করে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন- এ কে ফজলুল হক,আবদুল করিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ সকল নেতাদের যৌথ উদ্যোগেই বেঙ্গল প্যাক্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়। এই চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরদাতা ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু।

বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তাবলী

১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল প্যাক্ট ছিল বাংলায় হিন্দু- মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বেঙ্গল প্যাক্ট-এর প্রধান প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ-

১. স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব লাভ করবে।

২. স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা ৪০ টি আসন পাবে।

৩. সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে। যে পর্যন্ত এ সংরক্ষিত পর্যায়ে না ওঠে, ততদিন মুসলমানদের মধ্যে থেকে ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে শতকরা ৮০ জনকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে। অমুসলমানরা শতকরা ৪৫ ভাগ চাকরি পাবে এবং মধ্যবর্তী সময়ে হিন্দুরা শতকরা ২০ জন চাকুরি পাবে।

৪. কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যাপারে আইন পাস করতে হলে আইনসভায় নির্বাচিত উক্ত সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি নিতে হবে।

৫. মসজিদের সম্মুখে গান-বাজনা সহকারে মিছিল করা যাবেনা এবং গরু জবাই করার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

বেঙ্গল প্যাক্টের গুরুত্বঃ

বেঙ্গল প্যাক্টের গুরুত্ব নিম্নরূপ-

ক. এই চুক্তির ফলে হিন্দু- মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। ১৯২৩ সালের অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদ নির্বাচনে স্বরাজ দল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। বাংলায় ৩৯ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২১টি এবং হিন্দু এলাকার ৪৭ টি আসনের মধ্যে স্বরাজ দল ৩৬টি আসন লাভ করে। বেঙ্গল প্যাক্টের শর্ত অনুযায়ী কর্পোরেশনে ২৫ জন মুসলমান চাকুরি পায়।

খ. বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন চিত্তরঞ্জন দাশকে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি ১৯১৯ সালের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে অচল করার লক্ষ্যে উক্ত আমন্ত্রণ প্রথ্যাখ্যান করেন।

গ. বেঙ্গল প্যাক্ট বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চেতনা দান করে এবং ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রনয়নের পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করে।

ঘ. বেঙ্গল প্যাক্ট এর ফলে মুসলমানরা ব্যবস্থাপক পরিষদ, কলকাতা কর্পোরেশনসহ প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাগুলোতে মুসলমানরা বেশী পরিমাণে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ফলে মুসলিম নেতৃত্ব বিকশিত হয়। মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের একটি আবাসভূমির দাবি নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

বেঙ্গল প্যাক্ট বিলুপ্তি

বেঙ্গল প্যাক্ট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি আশা জাগানিয়া পদক্ষেপ হলেও শেষ পর্যন্ত এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গান্ধীর সমর্থক কংগ্রেস দল এবং স্বরাজ দল বিরোধী হিন্দুরা বেঙ্গল প্যাক্টের তীব্র বিরোধিতা করে। হিন্দু মহাসভার 'শুদ্ধি ও সংগঠন' নামক আন্দোলন এবং মুসলমানদের 'তাবলীগ ও তানজিম' নামক আন্দোলন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতোমধ্যে স্থাপিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে। তাছাড়া ১৯২৫ সালের ১৬ জুন বেঙ্গল প্যাক্টে অন্যতম প্রধান প্রবক্তা চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যু হলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শেষ সম্ভাবনাটুকুও তিরোহিত হয়। অন্যদিকে স্বরাজ দলের নেতৃবৃন্দ হতাশ হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করলে বেঙ্গল প্যাক্ট এবং স্বরাজ দল টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বেঙ্গল প্যাক্টের সফলতা ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোকপাত করুণ।**

বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্দেশ্য কী?	বেঙ্গল প্যাক্টের কী সফলতা ছিল?	বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা কারা?	কেন বেঙ্গল প্যাক্ট বিলুপ্ত হল?

সারসংক্ষেপ :

ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। এই চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যাঁদের অসামান্য অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হলেও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন বাস্তববাদী ও দুরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি জানতেন, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দাবি অগ্রাহ্য করে এবং তাদের অবমূল্যায়ন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, এদেশের মুক্তির জন্য দরকার হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই সর্বপ্রথম তিনি হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যা ইতিহাসে বেঙ্গল প্যাক্ত নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বেঙ্গল প্যাক্টের প্রধান উদ্যোক্তা কে?

ক. এ কে ফজলুল হক খ. চিত্তরঞ্জন দাশ

গ. বালগঙ্গাধর তিলক ঘ. নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

২. বেঙ্গল প্যাক্ট কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

ক. ১৯২৩ খ. ১৯৩৩ গ. ১৮২৩ ঘ. ১৮৩৩

৩. বেঙ্গল প্যাক্ট অনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা কতটি আসন পাবে?

ক. ৬০ খ. ৪০ গ. ৬৫ ঘ. ৩০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মধুপুর গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস তবে হিন্দুরাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, মুসলমানরা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। হিন্দুদের নেতা বাবু তরুণ কুমার দাশ মনে করলেন যে, গ্রামের উন্নয়নের জন্য হিন্দু- মুসলিম ঐক্য জরুরী, সেকারণে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের উপস্থিতিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন যাতে হিন্দু ও মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা এবং প্রতিনিধিত্বের ধরণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

(ক) বেঙ্গল প্যাক্ট কী? ১

(খ) বেঙ্গল প্যাক্টে মুসলমানদে কী ধর্মীয় সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রধান ধারাগুলো লিখুন। ৩

(ঘ) উল্লেখিত চুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.১৪ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভারত শাসন আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন ভারত শাসন আইনের পটভূমি, ধারা, রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব সম্পর্কে

	মুখ্য শব্দ	**নেহেরু রিপোর্ট. সাইমন কমিশন, হিন্দু-মুসলমান, স্বরাজ দল ও দ্বৈত শাসন**

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইনের অন্যতম মূলভিত্তি ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। ভারত শাসন আইন হঠাৎ করেই তৈরি হয়নি, এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯১৯ সালের আইনের ব্যর্থতা, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, বেঙ্গল প্যাক্ট, সাইমন কমিশন, নেহেরু রিপোর্ট, আইন অমান্য আন্দোলন, গোল টেবিল বৈঠক ও ব্রিটিশ সরকারের শ্বেতপত্র প্রকাশসহ নানাবিধ ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারত শাসন আইনের পটভূমি তৈরি হয়। ভারতবাসীর দীর্ঘ সংগ্রাম ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও গণঅসন্তোষ প্রশমনের জন্যে ভারত সরকার ১৯৩৫ সালে আইন প্রণয়ন করেন।

ভারত শাসন আইনের পটভূমিঃ

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের হিন্দু মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ এই আইনের মধ্যে নানাধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় যেমন-গভর্ণর জেনারেলের লাগামহীন ক্ষমতা, সীমিত ভোটাধিকার, ত্রুটিপূর্ণ দপ্তর বন্টন, আইন পরিষদকে একটি গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। ফলে ভারত শাসনের জন্য নতুন একটি আইনের প্রয়োজনিয়তা দেখা দেয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ঘোষণার পর ব্যাপক সহিংসতা দেখা দেয়। ভারতীয়রা মনেপ্রাণে আইনটি মেনে নিতে পারেনি। তারা এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস (মার্চ, ১৯১৯) করে এবং এ আইনের প্রতিবাদে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার চরম পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং মুসলমানদের চলমান খিলাফত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। যদিও শেষপর্যন্ত এ দুটি আন্দোলনই ব্যর্থ হয়। ভারত শাসন আইনের পটভূমি তৈরির ক্ষেত্রে বেঙ্গল প্যাক্টও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় কংগ্রেস থেকে এক দল ত্যাগী নেতা বেরিয়ে এসে স্বরাজ দল প্রতিষ্ঠা করেন। স্বরাজ দলের পক্ষ থেকে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক বেঙ্গল প্যাক্টের (১৯২৩) মাধ্যমে সরকারকে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান হয়। এ উদ্যোগটি ফলপ্রসু না হলেও, এটি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতীয়দের অসন্তোষ দূর করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সংবিধানের কার্যক্রম তদন্ত, দ্বৈত শাসনের কার্যকারিতা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়ন। যদিও ভারতীয়দের পাশ কাটিয়ে গঠিত কমিশন এবং কমিশনের প্রতিবেদনকে ভারতের সকল রাজনৈতিক দল প্রত্যাখ্যান করে। তথাপিও এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮) এবং জিন্নাহর চৌদ্দ দফা (১৯২৯) ব্রিটিশ সরকার প্রত্যাখ্যান করায় ভারতীয়দের মনে ক্ষোভ বৃদ্ধি পায় এবং ভারত শাসন আইন তৈরির পরিবেশ তৈরি হয়। নেহেরু রিপোর্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, ডোমিনিয়নের মর্যাদা, যুক্তরাষ্ট্র গঠন, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ভারতীয় পার্লামেন্ট এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন বাতিলের প্রস্তাব করা হয়। অন্যদিকে জিন্নাহর চৌদ্দ দফায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানার কারণে ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে আইন অমান্যের ডাক দেন। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে

আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার একদিকে এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই শ্বেতপত্রের শিরোনাম ছিল- "ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য প্রস্তাব সমূহ"। শ্বেতপত্রের প্রস্তাব বিবেচনা এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়নের জন্য লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৩৪ সালের ২২ নভেম্বর এর প্রতিবেদন পেশ করে। যদিও এই কমিটি শ্বেতপত্রে উল্লেখিত কোন প্রস্তাব পরিবর্তন করেনি। তবে প্রাদেশিক ও ফেডারেল আইন পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতেই ভারত শাসন বিল প্রণীত হয় যা ১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট কার্যকর হয়।

ভারত শাসন আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (ধারা):

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বলা হয় ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হবে। এই ব্যবস্থায় কমপক্ষে ৫০% দেশীয় রাজ্য থাকতে হবে অন্যথায় সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে না।

২. এই আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন। প্রাদেশিক বিষয়গুলো পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইতোপূর্বে গভর্নর তার ইচ্ছামত প্রাদেশিক প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।

৩. এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যেমন কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে থাকবে দেশ রক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা ও যোগাযোগ। প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে কৃষি ভূমিরাজস্ব, কারাগার বানিজ্য শিল্পসহ ৫৪টি বিষয়।

৪. দ্বৈত শাসন এই আইনের আরেকটি বিশেষ দিক। প্রদেশে দ্বৈত শাসনের অবসান হলেও এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। গভর্নর জেনারেল ছিলেন কেন্দ্রিয় শাসন ব্যস্থার প্রধান। তিনি ব্রিটিশ রাণীর প্রতিনিধি হিসেবে যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করেন।

৫. এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইন সভা উচ্চ কক্ষ ও নিম্নকক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ নামক দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রস্তাব করা হয়। এই আইনসভার মেয়াদ হবে ৫ বছর তবে গভর্নর জেনারেল চাইলে কার্যকালের মেয়াদেও আগেই আইনসভা ভেঙ্গে দিতে কিংবা মেয়াদ বাড়াতে পারতেন।

৬. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত রাখার প্রস্তাব করা হয়। আদালতটি একজন বিচারপতি ও ২ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হবে যারা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাদান এবং কেন্দ্রিয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসা করবে। এ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ইংলান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করার ব্যবস্থা থাকবে।

৭. এই আইনের মাধ্যমে উড়িষ্যা ও সিন্ধু নামক দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয় এবং বার্মাকে (বর্তমান মায়ানমার) ভারত বর্ষ থেকে পৃথক করা হয়।

৮. এই আইনে প্রথমবারের মতো স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও রাজ প্রতিনিধি পদ সৃষ্টি করা হয়। একই ব্যাক্তি গভর্নর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি হতে পারবেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি:

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের কোন রাজনৈতিক দলকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কংগ্রেস এটাকে ' দামি মুখোশের আড়ালে দেশবাসীর উপর বৈদেশিক শাসন ও শোষণ চালানোর অপচেষ্টা বলে অভিহিত করেন। আর কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু এটাকে A new chapter of Slavery বলে আখ্যায়িত করেন।

মুসলিম লীগও এই আইনকে সমর্থন করেনি। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এটিকে 'একেবারেই অগ্রহণযোগ্য' বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল লেবার পার্টি এই আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। লেবার পার্টির নেতা এটলির মতে, 'The kenote of the bill is mistrust' তিনি আরো বলেন, কংগ্রেসকে শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার জন্যেই এ আইন রচিত।

ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব:

বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যাপক কুপল্যান্ড এ আইনকে সৃজনশীল রাজনৈতিক চিন্তার অনন্য অর্জন বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, এ

আইনের মাধ্যমে ভারতীয়দেও ভাগ্য নির্ধারিত হয় এবং ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ সুগম হয়।

১. এই আইনের মাধ্যমে সংবিধান তৈরির ভিত্তি রচিত হয়।
২. স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম হয়।
৩. প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে এ আইন তুলনামূলকভাবে সফল হয়। এতে সীমিত আকারে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন বাস্তবায়ন হয়। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন কার্যকর হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ধারণা দিন।**

ভারত শাসন আইন কী?	ভারত শাসন আইনের প্রয়োজনিয়তা কী? ছিল?	সাইমন কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য কী?	ভারত শাসন আইনের প্রতি ভারতীয়দেও দৃষ্টিভঙ্গি?

সারসংক্ষেপ :

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসীর আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গণঅসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করেন। এই আইনকে বলা হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের ভিত্তি স্তম্ভ। ভারত শাসন আইনে ভারতীয়দের বিভিন্ন দাবী মেনে নেয়া হলেও এ আইন ভারতের কোন রাজনৈতিক দলকে খুশী করতে পারেনি। এমনকি ব্রিটেনের তৎকালীন বিরোধী দলও ভারত শাসন আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। নানামুখী সমালোচনা সত্ত্বেও ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্রিটিশ সরকার কত সালে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে?
ক. ১৯৩৩ খ. ১৯৩৪ গ. ১৯৩২ ঘ. ১৮৩৩

২. ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন গ. দ্বৈতশাসন ঘ. সব গুলো

৩. ভারত শাসন আইনে মুসলমানদের জন্য কতগুলো আসন সংরক্ষণ করা হয়?
ক. অর্ধেক খ. এক-তৃতীয়াংশ গ. এক-চতুর্থাংশ ঘ. এক-পঞ্চমাংশ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

পাইক্কান্দী গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী ইউনিয়ন যার চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মো. শাহজাহান। ইউনিয়নবাসীরা দীর্ঘদিন তাদের নানাধরণের দাবী নিয়ে চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করলেও কোন লাভ হয়নি ফলে তারা চেয়ারম্যান ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এতে কওে চেয়ারম্যান বাধ্য হয়ে ইউনিয়ন পরিষদেও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং একটি নীতিমালার মাধ্যমে দাবী পূরণের আশ্বাস দেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদেও পক্ষথেকে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হলেও অনেকেই এই নীতিমালার তীব্র সমালোচনা করেন।

(ক) ভারত শাসন আইন কবে কার্যকর হয়? ১
(খ) ভারত শাসন আইনের প্রতিক্রিয়া লিখুন ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে ভারত শাসন আইনের প্রধান প্রধান ধারাগুলো লিখুন। ৩
(ঘ) ভারত শাসন আইনের পটভূমিসহ এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.১৫ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি , বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে

মুখ্য শব্দ	**দ্বিজাতি তত্ত্ব, গোলটেবিল বৈঠক, জিন্নাহর চৌদ্দ দফা, লাহোর ও পাকিস্তান প্রস্তাব**

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক দল 'মুসলিম লীগের' একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় । যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার জন্য শেরে বাংলা একে ফজলুল হক উত্থাপিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় যা ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত। অবশ্য পরবর্তীতে এটিকে পরিবর্তন করে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে রূপদান করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের সীমাবদ্ধতা যতই থাকুক এটি মুসলমানদের একক পতাকাতলে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

প্রেক্ষাপট:

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হলেও এটির প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল অনেক আগে, ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সর্বপ্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতাবাদের ধারণা প্রদান করেন। তিনি মনে করতেন যে, ভারতে দুটি ভিন্ন জাতির বসবাস। যেহেতু তাদের জীবনাচার আলাদা তাই তাদের রাজনীতিসহ নানাবিধ কার্যক্রম আলাদাভাবেই করা উচিত। মূলত তার প্রচারণার কারণেই মুসলমানদের অনেকে হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ থেকে দূরে থাকে। মুসলিম লীগ গঠিত হলে হিন্দুরা বিদ্রুপাত্মক প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করে এবং ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। খিলাফত প্রশ্নে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনীতি মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাকে আরো বেগবান করে তোলে। হিন্দুরা তাদের রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে তাদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। জওহরলাল নেহেরু তার একটি বক্তব্যে বলেন যে, ভারতে দুটি শক্তির প্রভাব লক্ষণীয়। যথা- ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস। আবার দল মত নির্বিশেষে সকল দলের অংশগ্রহণে সাংবিধানিক সমস্যা নিরসনে নেহেরু কমিটি গঠিত হয় ১৯২৩ সালে। কমিটি ইতিপূর্বে মুসলমানদের অনুমোদিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দেবার সুপারিশ করে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বিষয়টিকে আরো গতিহীনতার দিকে ঠেলে দেয়। অনেক হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাই দুটি জাতি বিষয়টিকে মনে, প্রাণে বিশ্বাস করতো। উল্লেখ্য যে, লাহোর প্রস্তাবের অগ্রজ হিসেবে ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে দেয়া আল্লামা ইকবাল এর একটি ভাষণকে মনে করা হয়। তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার জন্য আহবান জানান। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫ টি এলাকার জন্য 'পাকিস্তান' নামের উদ্ভাবন করেন। পরে অবশ্য ভারত, বাংলা ও হিন্দুস্থান নামক তিনটি রাষ্ট্রের প্রস্তাবও করা হয়েছিল একবার। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও মুসলিম লীগ শুধুমাত্র বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও একক মন্ত্রি সভা গঠন করতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাতেও কংগ্রেস বিজয়ী হওয়ায় তারা মুসলিম লীগের সাথে আলোচনা ছাড়াই মন্ত্রিসভা গঠন করলে মুসলিম লীগ নেতারা এটিকে তাদের জন্য অপমানকর হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে তারা মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার বিষয়ে ঐক্যমত হবার চেষ্টা করছিল । যা বাস্তবায়নের জন্য একটি বড় ধরণের ধাক্কার প্রয়োজন ছিল এবং লাহোরে উত্থাপিত প্রস্তাবটি ছিল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য একটি প্লাটফর্ম। ১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চে লাহোরে অনুষ্ঠেয় মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশনে তৎকালীন সভাপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম দিনের সভাপতির ভাষণে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। মূল কথা ছিল মুসলমানের

জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে শেরে বাংলা, একে ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য একাধিক রাষ্ট্রের কথা উত্থাপন করলে তিনি তা মেনে নিতে পারেননি। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে তিনি লাহোর প্রস্তাবে রাষ্ট্রের এই বহুত্ববোধক (States) শব্দটিকে অসাবধানতাবশত এবং মুদ্রণ প্রমাদ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। সুতরাং এ প্রস্তাবের প্রথমে States এর বদলে State হবে।

লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন ও এর বৈশিষ্ট্য

লাহোর অধিবেশনের দ্বিতীয় ও সর্বশেষ দিনে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য তৎকালীন বাংলার মূখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হককে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং একই সাথে তাকে 'বাংলার বাঘ' শেরে বাংলা উপাধি প্রদান করা হয়। এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়-

নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে না বা তা মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা নিম্নলিখিত মূল নীতিভিত্তিক না হয়। যথাঃ প্রয়োজনবোধে সীমানার পুনর্বিন্যাস সাধন করে এবং ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর নিকটবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর সমন্বয় সাধন করে যেমন- ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলোকে একত্রিত করে একাধিক স্বাধীনরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে এবং এদের অঙ্গরাজ্য গুলোও স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

প্রস্তাবে আরো উল্লেখ করা হয় যে, যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানকার মুসলমানদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক , সামাজিক সর্বপ্রকার অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উঠে আসে-

১. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২. এ সমস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে স্বায়ত্বশাসিত।
৩. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৪. দেশের যে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় উপরোক্ত বিষয়সমূহকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া

ভারত বিভাগকে মহাত্ম গান্ধী 'পাপ কাজ' বলে আখ্যায়িত করেন। তার মতে, যদি আমরা শ্রী জিন্নাহর অভিমত গ্রহণ করি তাহলে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ আলাদা ও স্বতন্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হবে। হিন্দু সংবাদ পত্রিকাগুলোও লাহোর প্রস্তাবের সমালোচনা করতে থাকে। তারা এটিকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে আখ্যা দেয়। তবে এই লাহোর প্রস্তাবটি মুসলমানদের মধ্যে দারুণভাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় । এটি তাদের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। বাংলার মূখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এটির উত্থাপনকারী হলেও পরবর্তীতে এটিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপলাভ করায় তিনি তাতে সমর্থন দেননি। কারণ প্রস্তাবের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ নেই। তবে এই প্রস্তাবটির ইংরেজি অনুবাদে মুসলমানদের নিয়ে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করার কথা বলা হলেও এটিকে পরবর্তীতে 'একটি মুসলিম রাষ্ট্র' গঠন করার বিষয়টি প্রচার করা হয়। কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং জমিয়াতুল ওলামায়ে- ই- হিন্দ এর প্রধান নেতা মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বাঙালি মুসলমানরা লাহোর প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিল কারণ এই প্রস্তাবের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের বীজ বোপিত ছিল। জিন্নাহ সাহেব ১৯৪৬ সালে শঠতার আশ্রয় না নিলে ১৯৪৭ সালেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হতো, অপেক্ষা করতে হতো না ১৯৭১ পযর্ন্ত। তবে লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার একটু কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে। ভারত সচিব মন্তব্য করেন যে, ব্রিটেনের কোন সরকার বা পার্লামেন্ট ভারতের মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেবেন বলে তিনি মনে করেন না। এতে মুসলিম লীগ নেতারা আশ্বস্ত হন। তবে লাহোর প্রস্তাবটি পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলনে রূপান্তরিত হলে সহিংস আন্দোলন ভারত সরকারকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে যে, মুসলিম লীগের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে কোনো শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভক্তির পথ বেছে নেয়। ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামক নতুন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্বঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য লাহোর প্রস্তাব ছিল একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। যদিও 'একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অথবা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র' এ বিষয়টিতে বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ছিল । কিন্তু এটি ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে আশার আলো হিসেবে পরিচিত হয় এবং মুসলমানরা মুসলিম লীগের পতাকা তলে দলে দলে সমবেত হতে থাকে। এর প্রতিফলন ঘটে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপুল ভোটে বিজয়ের মাধ্যমে। এই ফলাফলে তাদের আন্দোলন আরো বেগবান হতে থাকে।এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের বীজ লুক্কায়িত ছিল লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে । অবশ্য আরো পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার মধ্যেও লাহোর প্রস্তাবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং লাহোর প্রস্তাব বাঙ্গালি মুসলমানদের চেতনা বোধ জাগ্রত করতে ভূমিকা রেখেছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**লাহোর প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরুণ।**

লাহোর প্রস্তাব কী?	লাহোর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কী?	লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া লিখুন।	দ্বি-জাতিতত্ত্ব কী?

সারসংক্ষেপ :

লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, সেটাই লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্বশাসন। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ লাহোর প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়, কারণ এতে শাসন ক্ষমতা বাঙালি মুসলমানদের হাতে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে জিন্নাহ রাষ্ট্রের এই বহুত্ববোধক শব্দটিকে মুদ্রণ প্রমাদ বলে উল্লেখ করে বলেন, পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন?

ক. এ কে ফজলুল হক খ. চিত্তরঞ্জন দাশ গ. বালগঙ্গাধর তিলক ঘ. নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

২. লাহোর প্রস্তাব কত সালে উত্থাপিত হয়?

ক. ১৯৪০ খ. ১৯৩৩ গ. ১৮৪০ ঘ. ১৮৩৩

৩. লাহোর প্রস্তাবকে ব্যাঙ্গ করে কি নামে অভিহিত করা হয়?

ক. বাংলা প্রস্তাব খ. পাকিস্তান প্রস্তাব গ.সিন্ধু প্রস্তাব ঘ. পাঞ্জাব প্রস্তাব

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

'ক' দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র যেটি ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে চলছে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন। ক এর জনগণ হিন্দু-মুসলিম দুভাগে বিভক্ত, তারা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী। মুসলমানদের জনৈক বাঙালি নেতা জনাব আজমল হক তাদের কেন্দ্রিয় দলীয় সভায় এ ধরণের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

(ক) শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কে? ১

(খ) লাহোর প্রস্তাবের মূলবক্তব্য কী? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে লাহোর প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখুন। ৩

(ঘ) উল্লেখিত লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.১৬ ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও ব্রিটিশ শাসনের অবসান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ও ভারত বিভক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন ব্রিটিশ শাসনের অবসান সম্পর্কে

	মুখ্য শব্দ	**গোলটেবিল বৈঠক, জিন্নাহর চৌদ্দ দফা, লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রস্তাব**

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। আর ভারতের স্বাধীনতা আইনের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে অবসান ঘটে ব্রিটিশ শাসনের যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে। ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন ও ভারত বিভক্তি এর সফল বাস্তবায়ন একদিনের আন্দোলন ও প্রচেষ্টার প্রতিফলন নয়। এর জন্য ভারতীয়দের অতিক্রম করতে হয়েছে সুদীর্ঘ ও বন্ধুর পথ।

ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপট ও গতি প্রকৃতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরে বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ অবসানের প্রক্রিয়া হচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকারও একটি নিয়মতান্ত্রিক পন্থা স্থানীয় জনগণের ওপর ভারতের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে যা 'আগস্ট প্রস্তাব' নামে বেশি পরিচিত। এতে বলা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতের সংবিধান প্রনয়নের দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করা হবে। সকল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সর্বোপরি ভারতকে একটি ব্রিটিশ 'ডোমিনিয়নের' মর্যাদা দেওয়া হবে। প্রস্তাবটি কংগ্রেস কর্তৃক যেমন গৃহীত হয়নি তেমনি মুসলিম লীগ কর্তৃকও সমর্থিত হয়নি। ফলে সরকারের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

একটি সুনির্দিষ্ট উপায় বের করতে তৎকালীন ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আগমন করেন। তিনি ১৯৪২ সালের ৩০ মার্চে একটি প্রস্তাব প্রদান করেন। যেখানে বলা হয়েছিল- ভারত অন্যান্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মত মর্যাদা পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি ইউনিয়নে পরিণত হবে। বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা হবে। ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ গণপরিষদ ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এবারও অখণ্ড ভারতের দাবিতে কংগ্রেস প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করেনি। আবার মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূ-খণ্ডের কথা উল্লেখ না থাকায় মুসলিম লীগও এটিতে সমর্থন দেয়নি। ফলে এচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এদেশীয়দের হাতে ক্ষমতা প্রদানের জন্য ১৯৪৫ সালের ১৪ জুন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নিকট একটি পরিকল্পনা প্রদান করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল। এটি ওয়াভেল পরিকল্পনা নামেও পরিচিত। এতে বলা হয় যে,অচিরেই নতুন সংবিধান প্রনয়ন করা হবে এবং ততোদিন এদেশে অন্তর্বর্তী কালীন সরকার দেশ পরিচালনা করবে। প্রশাসনে একমাত্র বড়োলাট ও সেনাপ্রধান ব্যতীত অন্য সকল পদে এদেশীয়দের নিয়োগ দেয়া হবে। গঠিত শাসন পরিষদে হিন্দু মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা হবে সমানুপাতে। সিমলায় ২৫ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন দলের সাথে ওয়াভেলের আলোচনা বৈঠক হলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতৈক্য না হওয়ায় এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সমর্থন পেতে নানা রকম প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। যুদ্ধ শেষে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড পি. লরেন্সের নেতৃত্বে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এ. ভি. আলেকজান্ডারসহ তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে ভারত পাঠানো হয়। মে মাসে তারা ভারত শাসন সংক্রান্ত একটি চূড়ান্ত সুপারিশমালা পেশ করে যা ক্যবিনেট মিশন নামে পরিচিত। এতে বলা হয় যে, শুরুতে ভারতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন একটি সরকার গঠিত হবে। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যপাল নিয়ে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা হবে। তিন ধাপে প্রদেশ গুলোকে বিভক্ত করে হিন্দু প্রধান, মুসলিম প্রধান, বাংলা ও আসাম গ্রুপ গঠিত হবে। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে এছাড়াও প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন ও কার্যকর হলে দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর থেকে ব্রিটিশ রাজকীয় সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটবে। যেহেতু এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে মুসলমানরা তাদের লক্ষ অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছাবে

একারণে মুসলিম লীগ এটিতে সমর্থন দান করে। শুরুর দিকে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারের বিষয়টি প্রত্যাখান করলেও তারা গণপরিষদে অংশ নেবে বলে জানায়। তবে মিশনের একটি বড় শর্ত ছিল যে, উপরোক্ত বিষয়গুলোর আংশিক মেনে নেওয়ার কোন বিধান থাকবে না। তৎকালীন বড় লাট ওয়াভেলের মুসলিম লীগের হাতে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা দিতে কিছুটা অনীহা ছিল। কেননা কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে অংশ নিতে অস্বীকার করে কিন্তু মুসলিম লীগ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য উৎসাহ দেখালেও ওয়াভেল তা গ্রহণ করেননি। যাইহোক পরবর্তী মাসে ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য নেহেরুকে অনুরোধ করেন। এতে মুসলিম লীগ চরমভাবে অপমানিত হয় এবং ১৬ আগস্ট সারা দেশে হরতাল ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে বড়লাট ওয়াভেলকে প্রত্যাহার করে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে তদস্থলে নিয়োগদান করা হয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনা প্রশমন করার দায়িত্ব নিয়েই মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে প্রেরণ করা হব। তিনি অনুভব করেন যে, হিন্দু মুসলিম উভয়ের দাবি না মেনে নিলে তা সম্ভব হবে না। তাই তিনি ভারতে এসেই ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই সুষ্ঠ ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এমন ভারতীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। মাউন্টব্যাটেন সার্বিক বিষয়ে বিবেচনা করে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এতে বলা হয়- আগামী ১৫ ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হলে সেখানে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হবে। আর যেহেতু বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিতর্ক আছে সেহেতু এদুটি প্রদেশ ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হবে। এছাড়াও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও আসামের সিলেট জেলা পাকিস্তানের সাথে থাকবে কিনা তা নিয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। নব গঠিত ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে যে, তারা কমনওয়েলথভূক্ত হবে কি না আর উভয় দেশদুটির সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আইন কমিশন গঠিত হবে। মাউন্টব্যাটেন এর পরিকল্পনা সংগ্রামরত দুটি বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানেরা মেনে নেওয়ায় এই পরিকল্পনা মতই ভারত স্বাধীনত আইন প্রণীত হয়। যা ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইনটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস করে।

ভারত স্বাধীনতা আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা

১) ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ব্রিটিশ সরকারের পরিবর্তে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে কার্যক্রম শুরু করবে এবং তারা ডোমিনিয়নের মর্যাদা পাবে।
২) বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা নামে আলাদা প্রদেশ গঠিত হবে।
৩) প্রত্যেক ডোমিনিয়নের জন্য আলাদা গণপরিষদ ও আলাদা আইন পরিষদ থাকবে।
৪) সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও পূর্ব বাংলা নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান রাষ্ট্র অন্যদিকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে ভারত রাষ্ট্র।
৫) প্রত্যেক রাষ্ট্রে একজন করে 'হেড অব দি স্টেট' হিসেবে একজন গভর্ণর জেনারেল দায়িত্ব পালন করবেন।
৬) উভয় দেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথভভূক্ত থাকবে কি না তা গণপরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে।
৭) এই আইন কার্যকর হলে দেশীয় রাজ্যগুলো হতে ইংরেজ শাসনের অবসান হবে এবং ব্রিটেনের রাজা 'ভারত সম্রাট' উপাধি পরিত্যাগ করবেন প্রভৃতি।

আইন কার্যকরঃ

আইন কার্যকরের মাধ্যমে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ আর ভারতের গভর্নর হিসেবে থেকে যান লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। জওহরলাল নেহেরু ও লিয়াকত আলী খান যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। আর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান

ভারত স্বাধীনতা আইন কার্যকর হবার মধ্য দিয়ে এদেশী হিন্দু ও মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের আশা- আকাক্ষা বাস্তবায়িত হয়। একই সাথে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। আইনটি ব্রিটেনের পার্লামেন্টে পাস হবার আগে অবশ্য কংগ্রেস কিছুটা অনাগ্রহ দেখিয়েছিল কিন্তু অন্য দিকে মুসলিম লীগ আপোসহীন থাকায় এবং তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে কংগ্রেস তাতে সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়। তবে একথা ঠিক যে, এই বিভক্তির ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল ভারতীয়রা তথা কংগ্রেস কেননা তারা অর্জন করেছিল বিশাল ভূখণ্ড । অপরদিকে মুসলিম লীগ নেতারা যেখানে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে অনঢ় ছিল এবং শেষ দিকে তারাই বেশি সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালনা করেছিল সেই তাদের ভাগ্যেই জুটলো কর্তিত ও তুলনামূলক ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ড। পূর্ব বাংলার মানুষেরা যে বুক ভরা আশা নিয়ে ১২শ মাইল দূরের একটি দেশের সাথে তাদের ভাগ্য

জুড়ে নিয়েছিল তা কয়েকদিন ভুল প্রমাণিত হলো। ক্রমেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা পশ্চিম পাকিস্তানের দাসত্বে পরিনত হচ্ছিল। সুদীর্ঘ ২৪ বছরের নির্যাতন ও নিপীড়ণের ইতিহাস পাড়ি দেবার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ৯ মাস স্বশস্ত্র যুদ্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছিল। যদি দেশ বিভাগের সময় তৎকালীন বাংলার রাজনীতিবিদরা সতর্ক থাকতেন তাহলে পূর্ব বাংলার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো এটা নি:সন্দেহে বলা যায়। তবে একথা ঠিক যে, ভারত বিভক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশদের সুদীর্ঘ ১৯০ বছরের শাসনাবসান ঘটে যা উপমহাদেশের জনগণের মূল আশা ছিল

শিক্ষার্থীর কাজ	**ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপট ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।**

ভারত বিভক্তি কী?	কেন ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হল?	আগস্ট প্রস্তাব কী?	মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দাও?

সারসংক্ষেপ :

ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভারত বিভক্তি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তেমনি ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণীত না হলে ভারত বিভক্তি সম্ভব হত না আবার ভারত বিভক্তি এতটাই অনিবার্য ছিল যে ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। হঠাৎকরেই ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণীত হয়নি এর পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং কতগুলোধারাবাহিক ঘটনা। ভারত শাসন আইন প্রণয়ণের মাধ্যমেই ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল এবং ব্রিটিশ রাজ 'ভারত সম্রাট' উপাধি পরিত্যাগ করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনটি কত তারিখে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে?
ক. ৪ জুলাই খ. ১৪ জুলাই গ. ১৫ জুলাই ঘ. ১৮ জুলাই

২. নিম্নোক্ত কোন প্রস্তাবটি ভারত স্বাধীনতা আইনের জন্য গৃহীত হয় ?
ক. আগস্ট প্রস্তাব খ. মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব গ. ক্রিপস প্রস্তাব ঘ.ওয়াভেল প্রস্তাব

৩. ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী স্বাধীনতা প্রাপ্ত পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে?
ক. লিয়াকত আলী খান খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. মুহম্মাদ আলী জিন্নাহ ঘ. একে ফজলুল হক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ব্রিটিশ শাসনামলে X নামক রাষ্ট্রে জনগনের মধ্যে এক ধরণের ক্ষোভ বিরাজ করছে এবং দেশটিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সে সকল উদ্যোগ ফলপ্রসু না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ক-এর জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের মাধ্যমে ক দেশটিতে ধর্মের ভিত্তিতে 'প' ও 'ভ' নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে।

(ক) ভারত স্বাধীনতা আইন কত সালে প্রণীত হয়? ১
(খ) ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হয়ে কোন দুটি প্রদেশ তৈরি হয়? ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে প্রনীত স্বাধীনতা আইনের প্রধান ধারাগুলো লিখুন। ৩
(ঘ) ভারত স্বাধীনতা আইনের পটভূমিসহ ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.১৭ ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার আর্থ- সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন
- আরো জানতে পারবেন ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে

	মুখ্য শব্দ	**কোম্পানির দেওয়ানী লাভ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও নীলচাষ**

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত উন্নত। এ অঞ্চলের গ্রামগুলো ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই তখন এ সব গ্রামগুলোতে পাওয়া যেত। মানুষের ছিল গোলা ভরা ধান এবং পুকুর ভরা মাছ। কুটির শিল্পের অবস্থাও ছিল সমৃদ্ধ। বাংলার তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় ইউরোপের কাপড়ের চেয়েও উন্নত ছিল। বাংলার বস্ত্রশিল্পকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করেছে এদেশীয় মসলিন। বাংলার কৃষিপণ্য এবং উর্বর জমির আকর্ষণে অনেকেই এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছে। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এদের অন্যতম। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোকে পরাজিত করে এবং স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা করে। বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ফলে এখানে নানাধরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত। তবে ইতিবাচক পরিবর্তনের চেয়ে নেতিবাচক পরিবর্তন বেশি হওয়ায় কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ- সামাজিক অবস্থা

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল আর এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল বাংলার কৃষি ব্যবস্থা। নদীমাতৃক বাংলার ভূমি চিরদিনই প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদে পরিপুষ্ট। এখানকার কৃষিভূমি অস্বাভাবিক উর্বর। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে বাংলায় উৎপন্ন ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান, গম তুলা ইক্ষু , পাট, আদা, জোয়ার, তেল, শিম সরিষা ও ডাল। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে পান, সুপারি ও নারকেল উৎপন্ন হত। বাংলার উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর অর্থ আয় করা হত। প্রাক-ব্রিটিশ আমলের কৃষি সাফল্যের উপর নির্ভর করে বাংলায় বস্ত্রশিল্প, চিনি শিল্প এবং নৌকা নির্মাণ শিল্প বিকাশিত হতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে কোম্পানির সিদ্ধান্তে বাংলার ঐতিহ্যবাহী কৃষিপণ্য (খাদ্য শস্য) বাদ দিয়ে শুরু হয় নীলচাষ। ফলে বাংলার কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ধ্বংস হতে শুরু করে এবং বাংলায় এক পর্যায়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

বাংলাদেশে নীলচাষ শুরু হয় আঠারো শতকের সত্তুরের দশকে। নীলচাষের জন্য নীলকরগণ কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। কৃষকের নীলচাষের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করত। বাংলাদেশে নীল ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের নিয়ন্ত্রণে। প্রথম দিকে নীলকরেরা চাষিদের বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ করলেও পরের দিকে তাও বন্ধ করে দেয়। ফলে ক্রমাগত নীলচাষ চাষিদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারা নীলচাষে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার রূপেও আত্মপ্রকাশ করে। তারা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে অবাধ্য নীলচাষিদের হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। এই বিবরণ থেকে ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাড়ায়। ইংরেজরা ভারতকে শোষণ করত এবং সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত নিজ দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্যে। বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদই গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল। কিন্তু ইংরেজরা নিজেদের দেশে শিল্পায়নের কাজে বিশেষ মনযোগী হলেও ভারতে বিপরীত নীতি অনুসরণ করত। ফলে কৃষির উপর চাপ বাড়তে থাকল এবং বেকারত্ব সমাজে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করল। দাদাভাই নওরোজী ভারতীয়দের চরম দারিদ্রের কারণ হিসেবে ইংরেজদের চরম বল্গাহীন অথনৈতিক লুণ্ঠন নীতিকে দায়ী করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত এই ব্যবস্থায় জমির উপর জমিদারের স্থায়ী মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় তারা উৎসাহিত হয়ে পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়। একই সাথে তারা নিজনিজ মালিকানাধীন জমিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ও উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেন। ফলে ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে গ্রামীণ সমাজ। কিন্তু অপরদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিতে প্রজাদের পুরানো স্বত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ফলে জমিদারের দয়ারও পরেই প্রজাদের জীবন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সৃষ্টি হয় নতুন সামাজিক সংকট। এছাড়া জমিদারের নায়েব-গোমস্তারা প্রজাদের উপর অমানবিক অত্যাচার করতে থাকে, এতেকরে জমির উৎপাদন কমতে শুরু করে এবং শুরু হয় অর্থনৈতিক সংকট। উপমহাদেশে জমি ছিল অভিজাত্যের প্রতীক। ফলে অনেক সাধারণ মানুষ তার অর্জিত আয় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ না করে জমিদারি কেনায় বিনিয়োগ করে। সে কারণে বাংলায় অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থা

ব্রিটিশ আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থা প্রাক- ব্রিটিশ আমলের ন্যয় গতিশীল ছিল না। এ সময় বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান এ দুটো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মূলত এই দুটি ধর্মকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ আমলে বাংলার সামাজিক রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশ প্রভাব। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান শাসনকালে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা এবং সমাজ জীবনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন সুলতান। এছাড়া সৈয়দ, উলেমা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমাজে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে বাংলার সমাজ কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বাংলার নবাব তৎকালীন সময়ে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হলেও তিনি ছিলেন ক্ষমতাহীন। মূলত ব্রিটিশ প্রতিনিধি এবং কোম্পানির উর্ধতন কর্মকর্তারা ছিলেন সমাজের উচ্চ স্থানীয়, এছাড়া জমিদার এবং তাদের নায়েব- গোমস্তারা সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করতেন। সমাজের নিম্ন শ্রেণিতে অবস্থান করতেন কৃষক ও প্রজারা। ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলার সমাজ কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিক্ষানীতির প্রবর্তক মেকলে বলেছিলেন, "আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে এমন একটা শ্রেণী সৃষ্টি করতে, যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের ভাবের মধ্যে আদান প্রদানকারী। এই শ্রেণির লোকেরা হবে রক্তে ও রঙে ভরতীয় এবং রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।" এই বক্তব্যের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়।

ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করত। তারা ভারতবাসীর প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করত। আর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের পেছনে ছিল তাদের জাত্যাভিমান। অধিকাংশ সময়ে তারা ঘোষণা দিতে দ্বিধা করত না যে ভারতীয়রা অনুন্নত ও বর্বব জাতির লোক। বহু ইংরেজ ভারতীয়দের সাথে অপমানজনক ব্যবহার করত। এমনকি দৈহিক নির্যাতনও করত। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজরা গুরুতর অপরাধ করলেও তাদের শাস্তি দেয়া হত না। রেলওয়ের কোন কামরায় ইংরেজ থাকলে সেই কামরায় কোন ভারতীয়কে টিকেট দেয়া হত না। বাংলার নবজাগরণ ব্রিটিশ ভারতের সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নবজাগরণকে বৈদেশিক শাসনের প্রথম পরোক্ষ ফল বলে অভিহিত করা যায়। এই নবজাগরণের নেপথ্য নায়কদের অন্যতম ছিলেন রামমোহন রায়(১৭৭৪-১৮৩৩)। রামমোহন ছাড়া ডিরোজিও এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়, কেশবচন্দ্র সেন, অ্যানি বেসান্ত, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখও এ ভাবধারার পতাকাবাহী ছিলেন। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দাসপ্রথা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও অনুশাসনগুলো স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের অন্তরায় ছিল। তাই রাজা রামমোহনসহ অন্যান্য সমাজ সংস্কারকবৃন্দ সেগুলো বিলোপ সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতের মুসলিম সমাজেও নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। উনিশ শতকে মুসলিম জাগরণে এবং এ সকল সমস্যা নিরসনে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সৈয়দ আহমেদ বেরেলভি, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, তিতুমীর, সৈয়দ আহমেদ খান, নাবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। সৈয়দ আহমেদ বেরেলভি মুসলমানদের ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ও সহজ সরল জীবন যাপনের শিক্ষা দেন। তিনি এদেশকে 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা দেন।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক অবস্থা

ব্রিটিশ আমলে বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির পাশাপাশি নানাধরণের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারত তথা বাংলায় মুসলিম শাসকদের প্রাধান্য ছিল। ফলে তাদের সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামী

ভাবধারার প্রাধান্য থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। ১৭৫৭ সালের পর থেকে বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলে মানুষের চিন্তা ধারায়ও পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ব্রিটিশ ভারতের সাহিত্য চর্চায় সেটা লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকের বহু কবি ও সাহিত্যিক তাদের লেখনির মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার করেন। এদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম সর্বাগ্রে। তার নাটক ও কাব্য বাংলার সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। গদ্য সাহিত্যে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ দেশবাসীর মনে স্বদেশীকতার আদর্শ প্রচার করেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুবিখ্যাত 'নীলদর্পন' নাটকে উপনিবেশবাদী ইংরেজদের নির্যাতনের এক নির্মম করুণ চিত্র নিখুত ভাবে তুলে ধরেন। তবে ভারতে স্বদেশিকতা প্রসাদে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর রচনাগুলো বিশেষ করে 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম' জাতীয় আন্দোলনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাও নবজাগরণ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে পরিব্রাজক, 'বর্তমান ভারত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশেষভাবে উল্লেখযো। তবে বাংলা সাহিত্যে চরম উন্নতি লাভ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর বহুমুখী ও কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রাক-ব্রিটিশ আমলের তুলনায় ব্রিটিশ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ ছিল। ব্রিটিশ সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের কারণে বাংলার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। ফলে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা। ব্রিটিশ ভারতে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য শুরু হয় নবজাগরণ বা রেনেঁসা।

শিক্ষার্থীর কাজ	**ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপট ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।**

বেঙ্গল রেনেঁসা কী?	সতীদাহ প্রথা কী?	নীলচাষ কী	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২টি সুবিধা লিখ?

সারসংক্ষেপ :

প্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এসময় বাঙালির থাকত গোলা ভরা ধান এবং পুকুর ভরা মাছ। কুটির শিল্পের অবস্থাও ছিল সমৃদ্ধ। বাংলার তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় ইউরোপের কাপড়ের চেয়েও উন্নত ছিল। বাংলার কৃষিপণ্য এবং উর্বর জমির আকর্ষণে অনেকেই এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছে। এরকমই একটি বানিজ্যিক কোম্পানি ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানি। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী হস্তান্তরের মাধ্যমে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক পরাজয় নিশ্চিত হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাজয়ের করণে এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কত সালে প্রবর্তিত হয়?

ক. ১৮৯৩ খ. ১৭৯৩ গ. ১৭৬৫ ঘ. ১৭৭০

২. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে দেওয়ানী লাভ করে?

ক. ১৭৬৫ খ. ১৮৬৫ গ. ১৭৫৮ ঘ.১৭৬৪

৩. 'নীলদর্পন'? কে রচনা করেন?

ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

গ. মাইকেল মধুসুদন দত্ত ঘ. কেশবচন্দ্র সেন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

'ক' দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ যেটি দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে রয়েছে। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ফলে দেশটির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। অপ্রচলিত এবং দেশীয় বাজারে চাহিদাহীন পণ্য জোরপূর্বক চাষাবাদের ফলে কৃষকরা কৃষি কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং কৃষি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করলে প্রচলিত অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

(ক) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কী? ১

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার সমাজ কাঠামোতে কি ধরণের পরিবর্তন এনেছিল? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে ব্রিটিশ আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরুন। ৩

(ঘ) ব্রিটিশ আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর আলোকপাত করুন। ৪

উত্তরমালাঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১. খ ২. ঘ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১. গ ২. ঘ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ : ১. খ ২. ঘ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১১ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১২ : ১. গ ২. ঘ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৩ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৪ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৫ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৬ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৭ : ১. গ ২. ক ৩. খ